চন্দ্রায়ণ

(জীবন্ত ইকনমিক্‌স)

অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী

প্রকাশক—শ্রীকমলকৃষ্ণ চৌধুরী
"আতালজ"
১০০নং আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৯

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

জীবনে মরণে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনের মধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

বয়স অনেক হইয়াছে, মানুষের সাধারণ জীবিত কালের সীমা বহুদিন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জড়তা ও দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে এই অবস্থায় বই লিখিবার শখ কেন হইল? উত্তর—শখ নয়, কবিযশ প্রার্থনাও নয়, কেবল মাত্র বার্দ্ধক্যের নিঃসঙ্গ অবসর বিনোদনের চেষ্টা। নিশ্চয় করিয়া আমার জানা আছে এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ত্রুটি বিচ্যুতির অভাব হইবে না।

অনেকস্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, উহাদের বাংলা পরিভাষা কোন কোন স্থলে আমার জানা নাই, আর যেগুলি জানা আছে তাহা আমার পছন্দমত বা সহজবোধ্য বলিয়া মনে হয় নাই। আরও এক কথা ইহাতে যেরূপ ধরণের পাত্র পাত্রীদের অবতারণা করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ এইরূপ মিশ্রভাষাই প্রচলিত দেখা যায়।

"নিভৃতি" (আন্দুল, হাবড়া)
কোজাগরী পূর্ণিমা
সন ১৩৫০ সালাব্দ।

অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী

চন্দ্রায়ণ

১

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। তাঁহার অপেক্ষাকৃত মোটা মাহিনার চাকরি ছিল কানপুরে এক সওদাগরী আপিসে, কিন্তু সেই অনুপাতে সাংসারিক খরচ ছিল তাঁহার বেশ মোটা রকম। কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে বিশেষ কিছু পাইলাম না।

ব্যয়সাধ্য পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া উপার্জনের চেষ্টায় নানা স্থানে—আমার অবস্থার বাঙ্গালীর একমাত্র পন্থা,—একটি চাকরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিয়া প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবুও প্রতিদিন মনোযোগ সহকারে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করিতেছি কিন্তু কোথায়ও কিছু সুবিধা হইতেছে না।

এরূপ সময় একদিন "ষ্টেট্‌সম্যান" পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়িল—

"Wanted a private tutor for a boy under Matric. Salary Rs. 50/- and boarding—Bengali Hindu Kayastha Preferred.

Roy—58, Thompson Street Rangoon."

"ম্যাট্রিকের নিচে পড়ে এমন একটি বালকের জন্য গৃহ শিক্ষক আবশ্যক। বেতন থাকা খাওয়া বাদ মাসিক ৫০৲ টাকা।"

রায়, ৫৮নং টমসন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

মন্দ কি, গুণাগুণতো কতকটা মিল হয়েছে। নূতন দেশটাও ত দেখা হবে ?

২

"পালামকোটা" জাহাজখানি রেঙ্গুনের ফেয়ার ষ্ট্রীট জেটিতে ভিড়িল, নামিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতেছি, কোন লোক আমাকে লইতে আসিয়াছে কিনা ? কিছু পরে একটি মাদ্রাজী ফিরিঙ্গী বেশধারী ছোকরা, একখানি ভিজিটিং কার্ড লইয়া বাঙ্গালী যাত্রীদের দেখাইতেছে ক্রমে আমার নিকট আসিয়া কার্ড দিতে দেখিলাম ছাপা—

C. K. Roy.

Burma Land Development Syndicate.

Spark Street, Rangoon.

বলিলাম হাঁ আমি মিঃ রয়ের বাড়ীতেই যাব বটে কিন্তু এ ঠিকানায় ত নয়। তাঁর ঠিকানা টমসন ষ্ট্রীট বলেই ত জানি।

—হাঁ তাই ঠিক, এটা মিঃ রায়ের অপিসের ঠিকানা, টমসন ষ্ট্রীটে তাঁর রেসিডেন্স (বাসভবন), আসুন বাইরে গাড়ী হাজির আছে।

বাড়ী পৌছাইয়া দেখিলাম মহল্লাটি নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে, রাস্তাগুলি সব পরস্পর সমান্তরাল ও প্রশস্ত, চারিদিক পরিষ্কার ঝরঝরে। পাশাপাশি বাড়িগুলি সব নূতন ও আধুনিক ধরণের সুন্দর, যেন ছবির মত। সকল বাড়িই কম্পাউণ্ড—হাতা সংযুক্ত। চন্দ্রবাবুর বাড়ির আসবাবপত্র বেশ সাদাসিধা হইলেও অতিশয় সুরুচির পরিচায়ক ও মূল্যবান কিন্তু কোথায়ও কোন বাহুল্যমাত্র নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মিঃ রায় আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বেশ লম্বা চওড়া কর্ম্মক্ষম চেহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, চক্ষু আয়ত প্রতিভা ব্যঞ্জক, দৃষ্টি ও কথার ভাব মনোহর, বয়স অনুমান ছত্রিশ সাইত্রিশ

হতে পারে। জুলপির ধারের সামান্য কিছু চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। বিলাতী দোকানের অর্ডারি দামী বিলাতী সুট পরণে।

গাড়ী হইতে নামিয়া প্রথমেই সোজা আমার ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন বসন্তবাবু জাহাজে কোন অসুবিধা হয় নাই ত? যেন আমি তাঁর কতদিনের পরিচিত, আমি বলিলাম—আজ্ঞে না, কোন কষ্ট হয় নি, ওয়েদারটা ভালই ছিল কিনা।

—এইটাই ত আপনার প্রথম ট্রিপ-সমুদ্রযাত্রা?

—হাঁ এই প্রথম।

—আপনার জলযোগের ব্যবস্থা গৃহস্থরা কিছু করতে পেরেছেন কি?

—প্রচুর প্রচুর!

মিঃ রায় বলিলেন—তাহলে আমি এই ভিক্ষের ভেক কাপড় বদলে ভদ্রলোক হয়ে আসছি, এসে আপনার সহিত আলাপ করা যাবে। মৃদু হাসি মুখে উপরে উঠিয়া গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি ছেলেকে সংগে লইয়া আসিয়া আমার ঘরেই বসিলেন। ছেলেকে দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখুন আপনার ছাত্র শরীরটা এর তত মজবুৎ নয়, দেখবেন যেন বেশী করে পড়িয়ে ফেলবেন না। এই বলিয়া মনখোলা একটা উচ্চহাস্য হাসিয়া লইলেন।

দেখিলাম ছেলেটির বয়স খুব কম, বোধহয় বৎসর নয় দশ মাত্র হইতে পারে। রোগা শৌখিন কিন্তু তার মধ্যে অত্যন্ত নধর কান্তি, কচি আঁম পাতার মত রং ও গড়ন। ঘন কাল রেশমের মত কোঁকড়া চুল, মুখখানি ও চোখ দুটি বড়ই সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

প্রায় একঘণ্টাকাল আলাপের পর একজন ভিজিটার আসাতে মিঃ রায় তাঁর বসিবার ঘরে উঠিয়া গেলেন। আমি বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ছোট ছেলের জন্য এত বেশি টাকা মাহিনার মাষ্টার কলিকাতা হইতে আনাইবার কি আবশ্যক ছিল।

এটা বোধহয় বড়মানুষী চাল, অথচ কথাবার্তায় ও ব্যবহারে এঁকে ত মোটেই চালিয়াৎ লোক বলিয়া মনে হইল না, বরঞ্চ অতি অমায়িক খোলাপ্রাণ স্বভাবের মতই ত দেখিলাম। কিছুদিন পরে কিন্তু এই রহস্যের পরিষ্কার সমাধান হইয়াছিল।

এই অল্পকাল মাত্র আলাপে ও চন্দ্রবাবুর সহৃদয় ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে আমি পরম আপ্যায়িত ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

৩

মিঃ রায়ের বই কিনিবার খুব শখ ছিল। বইএর সংগ্রহও মন্দ দেখিলাম না। বাংলা ও ইংরাজী চার পাঁচখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র তিনি আনাইতেন; ইহা ছাড়া লাইব্রেরি হইতে নিয়মিত বই আসিত। সমস্ত সকালটা দৈনিক খবরের কাগজ ও নিজের কাজকর্ম লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর কিন্তু, বিশেষ জরুরী না হইলে, তিনি কোন এন্‌গেজমেণ্ট রাখিতেন না। ঐ সময় তিনি মনোমত বই কখনও বা মাসিক পত্রিকাগুলি লইয়া সোজা আমার ঘরে ঢুকিতেন। ঘরে টেবিল চেয়ারের অভাব না থাকিলেও এই সময় তিনি সচরাচর মেঝেতে বার্ম্মীজ ডবল পাটী বিছাইয়া তাকিয়া লইয়া পুরাদস্তুর স্বদেশী ষ্টাইলে বসিতেন, কাজেই আমাকেও তাঁহার নিকট বসিতে হইত।

চন্দ্রবাবু কোনদিন নিজে পড়িতেন. কোনদিন বা আমায় পড়িতে বলিতেন। এই লইয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনা চলিত। এইরূপে আমরা এক এক দিন এত মগ্ন থাকিতাম যে চাকরেরা আহারের জন্য উঠিবার তাগাদা দিয়া বার বার ফিরিয়া যাইত। পরে স্বয়ং গৃহিনী পাশের ঘর হইতে দরজায় নক করিলে তাড়াতাড়ি আসর ভঙ্গ করিতে হইত।

এটি বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, চন্দ্রবাবু আমার সহিত বড় ভাইয়ের মত সর্বদা এমন সদয় ব্যবহার করিতেন, যে বুঝিতেই পারিতাম না আমি বিদেশে পরের বাড়ী চাকরিতে আছি।

এক বৎসর এইভাবে কাটিবার পর, একদিন মিঃ রায়ের বন্ধু মিঃ ইউ, পি সেন, সরকারী কার্য্য উপলক্ষে চন্দ্রবাবুর বাড়ী আসিলেন। ইনি পোকোকোর একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার; তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বড় অফিসারদের সহিত দেখা ও পরামর্শ করিবার জন্য হেড আপিস রেঙ্গুনে আসিতে হইত এবং আসিলেই মিঃ সেন প্রায় চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে উঠিতেন।

খাবার টেবিলে বসিয়া গল্প চলিতে চলিতে কথা প্রসঙ্গে সেন সাহেব বলিলেন—"ভাই চন্দর কাজ কর্ম্ম চালানত ক্রমে বিষম কঠিন হয়ে পড়ল, আমার ওখানে যে ক'টি গবচন্দ্র কণ্ট্রাকটার জুটেছে তাতে, অনেক চেষ্টা করেও, কাজের কোন প্রগ্রেস করা যাচ্ছে না। ভয় হয় কোন্‌দিন উপরওয়ালাদের ধমক না আসে। কেউ সাওয়ার পুলিসের পেনসনার, কেউ ত্রৈলঙ্গী কুলির সর্দ্দার, এক জিনিষ দশবার বুঝিয়ে দিলেও ঠিকমত করে তুলতে পারে না। মাপ যোপ হিসাব পত্রের কোন জ্ঞান নাই, বিল করবার সময় কিন্তু বেশ ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে করতে ভোলে না। জ্বালিয়ে তুলেছে।

চন্দ্রবাবু বলিলেন—তাইত এমন অবস্থা, আচ্ছা সেন আমি যদি তোমায় একজন কাজ জানা খুব ভাল কণ্ট্রাক্‌টার দিই তুমি তাকে ব্যাক্ —কাজে সাহায্য করবে বলতে পার? বাঙ্গালী।

—তুমি, খেপেছ চন্দর, যদি আমাদের শৌখিন বাঙালী বাবুরা মোটা ময়লা খাকি পরে রোদে জলে শক্ত হয়ে, রাস্তাঘাটের কাজে কুলি তাড়িয়ে পাঁচ দশ বছরের মধ্যে বেশ দু পয়সা কামিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচিয়ে চলে আসতে পারে, তবে পোষ্ট আপিসে,

রেল আপিসে, সওদাগরদের কুঠিতে, মারওয়াড়ীর গদিতে চির জীবনটা আধপেটা খেয়ে কে চাকরি করবে বল ?

সত্য বলছি ভাই, আমাদের মাস মাইনের মৌতাত যতদিন না ঘুচে যাবে ততদিন "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছিত কিন্তু আমরাও যে ঐ দলের সামিল হে। মাথার চুল সাদা হওয়ার সময় পর্যন্ত একজামিন পাস করতে কাটল তারপর এতদিন বনজঙ্গলে ঘুরে কি করতে পেরেছি বলত? দেখলাম কত তারাসিং পাঞ্জাবী, কত রামস্বামী, কত রামায়া ত্রৈলঙ্গি কুলীর সর্দ্দার, কনট্রাক্‌টরি করে, আমাদেরই হাত দিয়ে মোটা কামাই করে দেশে গিয়ে জমিদারি কিনে বসলো।"

চন্দ্র। "না সেন আই অ্যাম সিরিয়াস্, অর্থাৎ আমি বাজে কথা বল্‌ছি না। আমি বোধ হয় তোমায় একজন ভাল লোকই দিতে পারবো, তুমি এখানে কদিন থাকবে বল ত ?

সেন। কাল রাত্রের গাড়িতে আমায় গভর্মেণ্ট ব্রিকফিল্ড্ (ইট-খোলা) দেখতে যেতে হবে। জানই ত সেখানে এখন আমাদের মুখার্জী ইন্‌চার্য—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আছে, সে যে রকম ইয়ার মানুষ তাতে আবার একলা সেই বনবাসে থাকতে হয়, আমায় পেলে দুদিন আটকে না রেখে ছাড়বে কি ?

রয়। বেশ, ফেরবার সময় এখান হয়েই যেতে হবে ত ; এর মধ্যেই আমি তোমায় এ বিষয় ঠিক করে বলবো।

সেন। উদাস ভাবে, দেখা যাক্ !

৪

আজ বিকালে মিঃ সেন চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যার ছায়া বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যদিও পূর্ব আকাশে চন্দ্রদেব দেখা দিয়াছেন কিন্তু

তখনও স্পষ্ট করিয়া চক্ষু মেলিতে পারেন নাই। সমুদ্র-স্নাত শীতল অতি প্রীতিকর বাতাসের স্রোত তখনও শহরের দিকে ফিরে নাই অত্যন্ত গুমোট গরম।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "আজ গরমে আমাদের ঘরের মধ্যে বসিবার সুবিধা হবে না বোধ হয়, আসুন বসন্তবাবু বাগানে ফাঁকাতে আজ মজলিস করা যাক।"

বেতের চেয়ার, টিপয় নিয়ে পূর্ব দিক্‌কার বাগানের মধ্যে গিয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমি বলিলাম—"মিঃ রয়, আজ আমাদের যখন কোন নির্দিষ্ট পড়া বা আলোচনার বিষয় নাই, এ সময় আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? অনেক দিন হতেই এ বিষয়ে আমার একটু কৌতুহল আছে কিন্তু এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নাই।"

—নিশ্চয় পারেন, সঙ্কোচের কি আছে? আমি বলিলাম,—"দেখছি দশ পনর টাকা দিলেই আপনার মণিকে পড়াবার মত লোক এখানে অনেক পাওয়া যায়, তবে এত বেশী টাকা দিয়ে আমাকে আনাবার কি আবশ্যক ছিল সেই কথাটা আমি এতদিনেও বুঝে উঠতে পারছি না। আমি নিজেই লজ্জাবোধ করি, এই ভেবে যে, ভদ্র সন্তান হয়ে আমি অল্প কাজ করে, আপনার নিকট অনেক বেশী নিচ্ছি।

মিঃ রায়। এর একটা খুব সহজ উত্তর এই যে ভাল মিস্ত্রীকে দিয়ে বনেদ বানালে সমস্ত বাড়ীটিই বেশ সুন্দর ও স্থায়ী হয়। সেই রকম প্রথম হতে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর শিক্ষার ও সাহচর্যের ভার দিলে ছেলের ভবিষ্যৎ ভাল হবার সম্ভাবনাই ত বেশী। কেমন আপনার জেরার সহজ উত্তর পেলেন ত বসন্তবাবু?

কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা আংশিক ভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। বলিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটু যেন ভাবিয়া আবার বলিতে

লাগিলেন চন্দর রায়ের সিক্রেট (গোপন) অভিপ্রায়টা তা হলে আপনাকে প্রকাশ করেই বলি, কারণ আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার উত্তরটা আপনার কৌতুহল সম্পূর্ণ দূর করতে পারে নি।

আমি লজ্জিত হয়ে বলিলাম—"না—নাঃ সে কি কথা, আপনার মত লোকের নিকট, আপনার ব্যক্তিগত এই প্রশ্নটা উত্থাপন করাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশিষ্ট ও অন্যায় হয়েছে, আমায় ক্ষমা করতে হবে দাদা !

চন্দ্রবাবু একটু গাম্ভীর্যের সহিত বলিতে লাগিলেন—"দেখ আজ তুমি ভাবাবেশে আমায় "দাদা" বলে প্রথম সম্ভাষণ করলে, আমিও তাই তোমার নামের শেষের "বাবু" শব্দটা এখন থেকে বাদ দিলাম আর সর্বনামটা "আপনি" থেকে "তুমি"তে নামিয়ে আনলাম। আমার কোন ভাই, ভগ্নী নাই মার একমাত্র সন্তান আমি। কিছু দিন হতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তোমার মুখ থেকে ঐ দাদা শব্দটি শুনতে। আজ তুমি আমার সেই সাধটি পূর্ণ করলে। যখন আমাকে দাদাই করে নিলে তখন তোমায় কথাটি সমস্ত খুলেই বলি,—চন্দ্র রায়ের জীবন কাহিনী আজ পর্যন্ত একখানি খোলা চিঠি বিশেষ, এতে গোপন করবার মত বিশেষ কিছু দেখছি না, তবে, জানি না ভবিষ্যত আমার জন্য কি লুকিয়ে রেখেছেন।

শোন বসন্ত,—বাল্যকালে,—যখন লেখাপড়া শেখবার সময়, অবস্থা বৈগুণ্যে ইচ্ছা সত্বেও তাহার সুযোগ ও সুবিধা হয়ে উঠে নাই, এ আফসোস আমি জীবনান্ত পর্যন্ত ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।"

কিছুক্ষণ ধীরভাবে অপেক্ষা করিবার পর, বোধ হয় যেন তাঁর উচ্ছাসটি কতকটা দমন করিয়া লইয়া, চন্দ্রবাবু আবার বলিতে লাগিলেন —"ওহে বসন্ত তাই ত তোমায় নিয়ে রোজ সন্ধ্যা বেলায় পড়তে বসি। এখন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ছেলেকে পড়াবার জন্য হয় ত অল্প

টাকার মাষ্টারে চলতে পারত কিন্তু ছেলের বাবাকে পড়ানর জন্য তোমার মত একজন লোককে যদি কিছু বেশী টাকাই দিয়ে ফেলে থাকি, তাতে কি তোমাদের ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্সের প্রফেসর ডাক্তার প্রমথ বাড়ুঁয্যে মশাই আমাকে পাস নম্বরটুকুও দেবেন না। আমার এই ইকনমিক্স অর্থনীতি বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে পাওয়া নয়, আমার মত মূর্খ মানুষের সহজ বুদ্ধি দিয়ে, তাহার সরল মন-প্রাণ দিয়ে কেনা!

এইরূপ অপ্রত্যাশিত উদার উত্তর পাইয়া, নিরতিশয় বিস্ময় সহকারে আমি নিঃশব্দে তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং তাহাতে তাঁহার সরল নিরহঙ্কার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া চন্দ্রবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা শত গুণে বাড়িয়া গেল।

ক্ষণপরে মৃদু মৃদু হাস্য সহাকারে চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"এই যে দেখচ তোমার রায় মশাইটি বা তোমার এইমাত্র পাওয়া দাদাটি, এঁর জীবনের কাহিনী শুনলে বুঝবে তাহা একখানি জীবন্ত ইকনমিক্স—অর্থনীতি, আর সেই বৃত্তান্তের কতকটা শুনলেও সেটা হয়ত ভবিষ্যতে তোমার কিছু কাজে আসতে পারে; কিন্তু সে সব গল্প তোমায় পরে শোনাব তার পূর্বে তোমার সহিত একটি জরুরী কথার মীমাংসা করে নেওয়া দরকার মনে করি।

তখন মিঃ রায় বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা কালরাত্রে সেন সাহেবের কণ্ট্রাকটারদের বিষয়ে যে কথা হচ্ছিল তা শুনে তোমার কিছু মনে হয়েছিল কি?

আমি। আপনি কি সে সময় আমায় লক্ষ্য করেছিলেন?

মিঃ রায়। তাই যদি হয়? তোমার মত ঐ কাজের উপযুক্ত লোক ওরা আর কোথায় পাবে? তোমার মাথায় বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, সকলের উপর তুমি দু বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে এসেছ।

আমি। সে বিষয়ে আরও একটু বিবেচনা করবার নাই কি?

মিঃ রায়। তোমার অবস্থায়, আমি কিন্তু এ বিষয়ের মীমাংসা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই করতে পারতাম—নো রিস্ক্‌ নো গেন্‌—দায়িত্ব না নিলে উন্নতির আশা কোথায়? মানুষের উন্নতির অদৃষ্ট পথ ভগবান একবার দেখিয়ে দেন মাত্র। দেখিনি যাহাকে সেই অদৃষ্ট তা শুভও হতে পারে, অশুভও হতে পারে তবে আমার মনে হয়,—আমার বিশ্বাস,—আমার ফলিত জ্যোতিষ এই যে, দায়িত্ব, সততা ও পুরুষকার একত্র হলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অভিষ্ট সিদ্ধি করে, সকল সমস্যার শুভ সমাধান হয়ে যায়।

আচ্ছা তোমার সিদ্ধান্ত করবার পূর্বে তোমায় আমার প্রথম জীবনের গোটা কতক কথা শুনিয়ে দিচ্ছি শোনো। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে সংক্ষেপে তার পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত হইতে কিছু কিছু আমায় বলিতে লাগিলেন; সেদিনকার মত তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি সপ্রশংস স্বরে বলিলাম—আপনার মত প্রতিভা কি সকলের থাকে দাদা?

চন্দ্রবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"প্রতিভা" প্রতিভা নয় বসন্ত, প্রতিভা নয়। কেবল ঐকান্তিক চেষ্টা, সততা আর শ্রীভগবানে নির্ভরতা!

চন্দ্রবাবুর বর্ণিত ওই কাহিনী আমার মনে আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা জাগাইয়া দেয়। কর্ম্মজীবনে তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য; উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি ঐ সময় দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার তিনি উল্লেখ করিতেন, তাঁর বলিবার পদ্ধতি এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে সে কথার অধিকাংশই এখনও আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে।

যে কাহিনী রায় মহাশয় ঐরূপে আমায় শুনাইয়া এই জীবন্ত ইকনমিক্সের পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুরাতন

ডাইরি হইতে যাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম সেইগুলি আমি আমার দেশের তরুণ ও উদ্‌যোগী ভাইদের অবগতির জন্য কতকটা পর পরিচ্ছেদ গুলিতে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা,—যদি তাহা পড়িয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও কর্মপ্রচেষ্টা জাগরিত হয় তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

বলা বাহুল্য আজ আমাদের আলোচনা শেষ হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর দেখিলাম চন্দ্রদেব মধ্য গগন আলো করিয়া তাঁর সুধাস্রাবী আলোকরশ্মি সম্পাতে ধরিত্রী দেবীকে সুধাময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের চিরন্তনী বাসন্তী বায়ুর বেগ সমস্ত দিন নীল জলধির সহিত মাতামাতির পর ক্লান্তিবশে মৃদুমধুর প্রবাহে সঞ্চালিত হইতেছে; কিন্তু তাহার চির চঞ্চলতার পরিচয় স্বরূপ স্থির থাকিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থিত জেসমিনকুঞ্জে ঢুকিয়া ছোট ছোট লাজনম্র ফুলগুলির হৃদয় সম্পদ সুবাসটুকু লুটিয়া আনিয়া লুটের মাল লুটাইয়া দিতেছে এবং দূরস্থিত প্যাগোডার স্বর্ণচূড়ার ঝালরের ঘণ্টাগুলিকে দোলাইয়া শ্রুতিমধুর নিক্কনে ভগবান্ তথাগতের পবিত্রতম আবাহন মন্ত্র নিক্কনিত করিতেছে।

৫

চন্দ্রকান্ত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের সন্তান। তাঁহার পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ রায় একজন মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহার আয় সালিয়ানা প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ছিল। মাত্র দুই বৎসর বয়সে চন্দ্রবাবু পিতৃহীন হন।

অতঃপর প্রতিবাসী জ্ঞাতি দয়ালু বন্ধুদের, কাইণ্ড ফ্রেণ্ডদের, চক্রান্তে ও নিজ খুড়া মহাশয়ের অসাবধানতায় যথাসময়ে সরকারী রাজস্ব জমা না হওয়াতে বৈকুণ্ঠ রায়ের জমিদারি কালেক্টরি খাজনার দায়ে নিলাম বিক্রয় হইয়া যায়।

রায়-পরিবার যখন এইভাবে সর্বস্বান্ত হইয়া যায় তখন চন্দ্রবাবুর বয়স চৌদ্দ বৎসর। প্রথম দুই বৎসর বালক নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ভালরূপ উপলব্ধি করতে পারে নাই; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত চক্রান্তকারী জ্ঞাতিদের শ্লেষপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহাকে দারুণ মর্মপীড়িত করিয়া তুলিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহাতে চন্দ্র হতাশ বা অভিভূত না হইয়া বরং দিনে দিনে নিজেদের পূর্ব স্বচ্ছল অবস্থা ফিরাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

এমত অবস্থায় শত্রুব্যূহ মধ্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে এতদূর কষ্টকর ও বিপদজনক হইয়া উঠিল যে তাঁহার বয়স কুড়ির কোঠার প্রথম ধাপে পা দিবার পরই ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দৃঢ়ব্রত চন্দ্রবাবুকে সামান্য একটি চাকরি লইয়া সুদূর বিদেশ যাত্রা করিতে হইল।

উনবিংশ শতকের শেষদিন, অর্থাৎ ইং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা পাঁচটার সময় চন্দ্রকান্ত রেঙ্গুন বন্দরে অবতরণ করেন। ঐদিন বালক চন্দ্রের পকেটে একটি গোটা আধুলিমাত্র সম্বল ছিল।

সেই শীতের সন্ধ্যায়, সুদূর অপরিচিত দেশে, স্থানীয় ভাষানভিজ্ঞ সহায় ও সম্বলহীন বালক, বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান চন্দ্রের—বিদায়কালীন মাতার সজল চক্ষু, মলিন মুখচ্ছবি ও আজন্ম পৈত্রিক বাসভবনের কথা স্মরণে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই চক্রান্তকারী প্রতি-বাসীদের উপর তাঁহার প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা, তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র সাধনা—যে কোন উপায়েই হউক অর্থ উপার্জন করিতেই হইবে, পিতামহ মহাশয়ের ন্যায় তাহাকেও জমিদার হইতেই হইবে, এইরূপ সংকট অবস্থাতেও চন্দ্রকান্তকে অযথা কাতর হইতে দিল না। তিনি ধীর ও দৃঢ় পদে গন্তব্য উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

আমাদের চন্দ্র রায় যে চাকুরিটি লইয়া রেঙ্গুন গিয়াছিলেন সেটি অতিশয় বিশ্বাসের কার্য্য, কিন্তু দৈনিক অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ের

মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যাইত। সকালে দুই ঘণ্টা কাজের পর কিছু করিবার থাকিত না। চন্দ্রকান্তের মত ভাগ্যান্বেষী যুবকের পক্ষে, এই নির্বান্ধব বিদেশে সুদীর্ঘ অবসর সময় কাটান একান্ত বিরক্তিকর বোধ হইত।

চন্দ্রকান্তের আপিসের পাশের বাড়ীতেই একটি ফটোগ্রাফিক ষ্টুডিও ও ষ্টোর ছিল। ষ্টোরের নাম "কে. আর. অধিরাজ এণ্ড কোং" আর উহার মালিক বাবু কৃপারাম অধিরাজ একজন শীকারপুরী সিন্ধী ভদ্রলোক। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কিছু উপর হইলেও, বেশ বলিষ্ঠ দেহ এবং সকল কাজে তিনি একটি অতিশয় তৎপর মানুষ। কোন কঠিন পীড়া হইয়া বাল্যকালে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়, অতএব বর্তমানে তিনি এক চক্ষু শুক্রাচার্য্য মুর্তি।

কৃপারাম বাবুর একমাত্র পুত্র বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতেছেন, ইনের অবকাশ সময়টা আমষ্টারডাম শহরে থাকিয়া সেখানকার এক হীরকাদি মূল্যবান জহরত ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে ঐ ব্যবসাও শিক্ষা করিতেছেন। পিতা কৃপারাম বাবুর ইচ্ছা পুত্র ব্যারিষ্টারি অপেক্ষা ঐ জহরতের কাজ উত্তমরূপে শিখিয়া আসেন।

৬

কৃপারাম শেঠ এই কারণে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথকে তাঁহার সহকারী রূপে নিকটে রাখিয়াছেন ভোলানাথবাবু চন্দরের প্রায় সমবয়সী। সমান বয়স ও সান্নিধ্য সহজেই বন্ধুত্বের কারণ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

ভোলানাথ চন্দ্রকে ফটোগ্রাফি শিখাইয়া দিতে রাজী হওয়ায় চন্দ্র প্রত্যহ তাহাদের ষ্টুডিওতে যাতায়াত করিতেন। ভোলানাথ উক্ত প্রতিশ্রুত কাজ শিখাইবার অপেক্ষা নিজের অনেক অকাজে কুকাজে

চন্দ্রকে সংগী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চন্দ্র এজন্য সর্বদা তাঁহাকে সাবধান ও নিষেধ করিতেন বটে, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী" ফলতঃ বাধ্য হইয়া চন্দ্রকে ফটো ষ্টোরে যাতায়াত বন্ধ করিতে হইল।

একদিন বৈকালে ছুটীর পর আপিস হইতে বাহির হইয়া চন্দ্র দেখিলেন কৃপারাম বাবু তাঁহার বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিবামাত্র ইঙ্গিত করিয়া তিনি চন্দ্রকে নিকটে ডাকিলেন।

যথারীতি অভিবাদনাদির পর কৃপারাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "Well Mr. Roy" why dont we see you in our place now a days ? (মিঃ রায়, আজ কাল আপনাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিতে পাই না কেন ?) চন্দ্র সহসা কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মুখ নত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ তখন মৃদু স্নিগ্ধ মধুর হাস্যের সহিত বলিলেন, মিঃ রায়, আমি সকল খবরই রাখি, আমার যদিও একটি মাত্র বৃদ্ধ চোখ, তথাপি ছোকরাদের ডবল জোলসদার চোখের অপেক্ষা একটু যেন অধিকদূর পর্যন্ত দেখিতে পাই। আমি ভাল রকম জানি আপনি ভোলাকে সময়ে সময়ে অনেক বিষয়ে সাবধান করেন ও সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর স্লেপ্যাগোডা জেটীতে বসে ভোলার সংগে আপনার যে সমস্ত আলোচনা হতেছিল, অতি নিকটে বসে আমি তার সমস্তই শুনেছি। একে অন্ধকার রাত তার উপর নিজেদের প্রসঙ্গ নিয়ে আপনারা এত মত্ত ছিলেন যে আমাকে লক্ষ্য করতে পারেন নি।"

আপনার ন্যায় যুবকের এরূপ সৎবুদ্ধি, সংযম ও চরিত্র বল আমি খুব অল্পই দেখেছি। এই সকল মহৎ গুণগুলি দ্বারা আপনি আমার অতীব শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করেছেন। আশাকরি আপনার অবসর সময়ে পূর্বের মত আমার গদিতে আসবেন, তাতে আমি অতিশয় সুখী হবো।

ফটোতোলা ত অতি সহজে ও অল্প সময়ে শেখা যায়। তার অপেক্ষা অনেক লাভজনক কাজ হয়ত আপনি এই ওল্ড ফুলের কাছ থেকে, চেষ্টা করলে আদায় করে নিতে পারবেন, মিঃ রায়।

চন্দ্র। আপনার ন্যায় সাধু ও অভিজ্ঞ লোকের সংগ ও উপদেশ নিশ্চয়ই আমি অশেষ মূল্যবান ও প্রার্থনীয় বলে মনে করি, শেঠজী।

কৃপারাম বাবুর সহিত এ সমস্ত আলাপ ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল ও ইহার পরেও সেই ভাষাতেই হইত।

চন্দ্রকান্ত কৃপারাম বাবুর গদিতে আসিলেই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের কামরায় বসাইতেন। অল্পদিন যাতায়াতের পরই দেখা গেল তাঁহার ফটোর কাজ বর্ম্মাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হইলেও উহা তাঁহার প্রধান ব্যবসা নয়। কৃপারাম শেঠের প্রধান ব্যবসা ছিল হুণ্ডী ও নানাবিধ তেজারতীতে সুদে টাকা খাটান।

বর্ম্মা, চিন, জাপান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে তাঁহার স্বদেশী অনেক সিন্ধী ব্যাপারীরা রেশমী কাপড়, ও কিউরিওর (আজব পুরাতন দ্রব্যাদির) ব্যবসা করিত, তাঁহাদের টাকা আদান প্রদানের সুবিধার জন্য ঐ হুণ্ডীর কাজ বেশ জোর ও লাভবান ছিল। হায়দ্রাবাদ, শিকারপুর, করাচি প্রভৃতি সিন্ধু প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে এবং কলিকাতা বম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রেও কৃপারাম শেঠের সম্ভ্রান্ত এজেন্ট নিযুক্ত ছিল।

৭

এইরূপ দুই তিন মাস যাতায়াতের পর, একদিন চন্দ্রবাবুকে একা পাইয়া, শেঠজী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, মিঃ রায় আমার ঘরে বসে আপনি যে সময়টা কাটান আপনার মনে হয় কি ঐ সময়টা আপনার মিথ্যা নষ্ট হয়?

—সেটা এখন ঠিক করে বলতে পারছি না সার, তবে এখানে অনেক ব্যবসায়ী ভদ্র লোকদের সঙ্গে আলাপ করে মনে হয় যেন আমার মাথায় নুতন কিছু একটা গড়ে উঠ্‌ছে।

—হাঁ দেখেছি, আপনি যেরূপ মনোযোগ দিয়ে তাঁদের আলোচনা শোনেন ও কার্য্যাদি লক্ষ্য করেন তাতে ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। আমি ঠিক এই আশাই করেছিলাম চন্‌ড্রা (চন্দ্র) বাবু।

একমাত্র চক্ষুটি কিছু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইবার পর শেঠজী জিজ্ঞাসু মুখে বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা আপনি ত বলেন দৈনিক কাজ সারা হয়েও আপনার অনেক সময় হাতে থাকে। আপিস টাইমে কোন সময় আপনার অবসর থাকে বলুন ত ?

—আমি সকালে আটটার সময় আপিসে আসি। পূর্ব্বদিনের ক্যাস-বই লিখে জমা খরচ মিলিয়ে সাড়ে দশটার মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা পাঠাবার পর আমার আর বিশেষ কোন কাজ থাকে না। পরে আধ ঘণ্টা খাবার জন্য যায়, বাকি সময় লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ে সময় কাটে। পাঁচটার পর কিছুক্ষণ নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে দু তিন ঘণ্টা আপনার এখানে কাটিয়ে বাসায় ফিরি, এই হচ্ছে আমার দৈনিক কাজের তালিকা।

—তা হলে দেখা যাচ্ছে যে বেলা একটার পর চারটা পর্য্যন্ত সময়টা আপনি অন্য কোন কাজে লাগাতে পারেন।

—তা সহজেই পারি বোধ হয়, সর্বদা কাজই ত আমি খুঁজি সার।

কৃপা। আপনি জানেন মিঃ ব্যানার্জী, সিনিয়ার, আমাদের ফার্মের "ল" অফিসার (বাঁধা উকিল) প্রতিদিনই তাঁর কাছে আমাদের আদালতের কাজের জন্য যেতে হয়। উকিল বাবুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে আমি ভোলা বাবুকে পাঠাই কিন্তু ভোলা ভাল ইংরেজী বলতে পারে না, কাজেই ব্যানার্জীকে ঠিকমত উপদেশ দেওয়া হয় না, এইজন্য অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি ও অসুবিধা হয়ে পড়ে।

রায় ; আপনি তাঁর স্বদেশী, ইংরেজী ভাষায় আপনার বেশ বলবার ক্ষমতাও আছে অতএব আপনি যদি আমার এই কাজটি করেন তবে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় তাকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে পারবেন, এ বিষয়ে আপনি আমার সাহায্য করতে রাজী আছেন কী ?

—আমায় এ কাজের ভার দিলে আমি বোধ হয় আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব, বাল্যকালে বাধ্য হয়ে আদালতের কাজে আমায় অনেক সময় দিতে হয়েছে অতএব এবিষয়ে আমার কতকটা অভিজ্ঞতাও আছে।

—এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুসী হলাম, রায়। এই কাজের জন্য আমি একজন জুনিয়ার বাঙালী উকিলকে নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছিলাম কিন্তু এ কাজে আমার অতি বিশ্বাসী লোকের দরকার কারণ ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক গোপন কথা তার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। এখন দেখছি আপনিই এই কাজের সর্বরকমে উপযুক্ত পাত্র। কবে থেকে আপনি এ কাজে হাত লাগাতে পারবেন ?

—আপনি যে দিন আদেশ করবেন শেঠজী।

—বেশ কথা, কাল দেওয়ালী, আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম দিন, একটি শুভদিনও বটে। কাল হতেই আপনি এই কাজ আরম্ভ করুন। এ কাজের জন্য আপনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে পারিশ্রমিক পাবেন।

চন্দ্র বিনীত ভাবে জোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শেঠজী অতি অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্পন্নই ছিল কিন্তু আজ আমি নিঃস্ব, আমার টাকার অভাব যতই হোক, তবু মাপ করবেন মাস মাহিনার চাকরি আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। কারণ আমরা বাঙ্গালী অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও উদ্যমহীন, একবার মাস মাহিনার আস্বাদ পেলে কোন উন্নতির চেষ্টা আর আমাদের দ্বারা হয় না।

তবে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি মাসমাহিনার কাজ নিয়ে

এদেশে এসেছি কেন, আর ঐ কাজেই বা আজ পর্যন্ত নিযুক্ত আছি কেন? আমার এই চাকরি আপাততঃ আমার ব্যক্তিগত খরচ চালাবার অন্যতম একটি উপায় বলেই আমি মনে করি। আপনার নিকট সত্য গোপন করবো না, আমি আপনার কাজ স্বীকার করছি কেবলমাত্র কাজ শেখবার জন্য।"

কৃপারাম বাবু অনেকক্ষণ নিবিষ্টমনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন—"আ—চ্ছা তাই হবে"। মনে ভাবিলেন জমিটা মন্দ নয়, দেখা যাক ফলনটা কিরূপ হয়।

চন্দ্র অতি মনোযোগ সহকারে ও যত্নপূর্বক শেঠজীর আদালতের কার্য চালাইতে লাগিলেন। এখন হইতে শেঠজী ক্রমে ক্রমে চন্দ্রবাবুর উপর অধিকতর বিশ্বাসের ও দায়িত্বপূর্ণ মূল্যবান কার্যের ভার দিতে লাগিলেন।

আমি যে সময় চন্দ্রবাবুর বাড়িতে থাকিতাম, সময়ে অসময়ে সুবিধা পাইলেই তাঁহার পূর্ব জীবনের ঘটনাবলীর গল্প তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়া লইতাম। চন্দ্রবাবুর গল্প বলিবার ভংগী অতিশয় সুন্দর ও মনজ্ঞ ছিল বলিয়া তাহা শুনিয়া সময়টা বেশ আমোদে কাটিত।

চন্দ্রবাবুর জীবনের ধারাবাহিক ঘটনার বিবৃতি দিবার পূর্বে তাঁহার রেঙ্গুণে পৌছিবার অব্যবহিত কয় বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ও সমস্যা তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে যতটুকু আমার স্মরণে আছে তাহা এই স্থানে পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আশা ঐ সকল প্রসঙ্গ চন্দ্রবাবুর চরিত্রের গঠন, দৃঢ়তা, সততা ও কর্ম্মকুশলতার উপর কতকটা আলোকপাত করিতে সমর্থ হইবে।

———

৮

দুইদিন হইতে বৃষ্টির বিরাম নাই, শ্রাবণের আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন। দুর্যোগ থামিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ঘরের বাহির হইবার সুবিধা নাই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিছানায় গড়াইয়া একটু আরাম করিতেছি। হাতের কাছে চন্দ্রবাবুর দেওয়া ডাইরি বইগুলি সাজান ছিল, তাহার মধ্য হইতে একখানি লইয়া খুলিতেই ঐ পৃষ্ঠায় বড় হরপে লেখা নজরে পড়িল,

"নিতাই চরণ বশাক
উপকারের পরিশোধ—প্রতারণা
ইং ৩রা অক্টোবর.........সাল।"

অনেক দূর অবধি ইহার আগের ও পরের পাতাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াও এই রহস্যের কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না। ক্রমেই কৌতুহল বাড়িয়া চলিল। সেদিন আমাদের দৈনিক সান্ধ্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই চন্দ্রবাবুকে ঐ পৃষ্ঠাটি খুলিয়া দেখাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার তাৎপর্যটা কি দাদা ?

চন্দ্রবাবু। ভায়া তুমি আমার জীবনের কোন রহস্যই না জেনে ছাড়বে না দেখছি।

—প্রথমদিন আমায় বলেছিলেন, বোধ হয় মনে আছে "চন্দ্র রায়ের জীবন কাহিনী একখানি খোলা চিঠি, এতে গোপন করবার কিছু নাই" তা ছাড়া আপনি স্বইচ্ছায় কতদিন আপনার জীবন বৃত্তান্তের অনেক কথা ত আমায় বলে থাকেন। সেই ভরসাতেই ত আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয়েছি, দাদা।

—আচ্ছা তুমি আমার এসব কথা কেন এত মনোযোগ দিয়ে শোন, আর তার খুটিনাটিটি পর্যন্ত এত যত্ন করে মনে রাখ, বলত ?

—আমি আপনার জীবনী লেখবার জন্য তার মাল মসলা জোগাড় করছি যে, দাদা।

—সে কি হে বসন্ত! আমায় ভাবিয়ে তুললে যে, এমন দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হল বলত ? ইকনমিক্স বলছে এটা পণ্ডশ্রম মাত্র, সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম! কোন লাভ নেই, কোন দরকার নেই, এতে হাত লাগিও না।

—আপনি যেমন সব কাজ ইকনমিক্স্ দিয়ে বিচার করেন; আমি কিন্তু আপনার ছাত্র হয়েও ইকনমিক্সের সংগে একটু আধটু স্বপন দেখে থাকি, দাদা।

—ছাত্র ? ব্যাড্ বয়, তা হলে 'কেচ্ছাটা' লিখবেই, ছাড়বে না ?

—একবার চেষ্টা করে দেখব অন্ততঃ।

—যদি একান্তই তোমার এই দুরভিসন্ধি হয়ে থাকে, তবে নাম ধাম গুলো একটু অদল বদল করে দিও, না হলে আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। এ কথা গোড়াতেই তোমায় স্পষ্ট করে বলে রাখছি কিন্তু।

আমি তখন বলিলাম—অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন দাদা? যদি লিখতে পারি, সে বিষয়ে আমি সাবধান থাকব। এখন বলুন দেখি নিতাই চরণের উপাখ্যানটা।

কিছুক্ষণ ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"উপাখ্যান, প্রায় নলরাজার উপাখ্যান বল্‌লেও চলে।" পরে উদাস নয়নে যেন স্বগতঃ উক্তি—সে কথা আমার এ অবস্থায় ভুলে যাওয়াই উচিত ছিল, ভোলবার চেষ্টাও ত করেছি, আঘাত করেছিল গুরুতর রকম ক্ষতটা হয়েছিল একটু গভীর, দাগটা এখনও মিলায় নি বোধ হয়, তাই ভুলে যেতে পারিনি আজও। তবে সংক্ষেপেই শেষ করি শোন।

সংক্ষেপে কেন দাদা, একটু বিস্তারিত রকম হলেই বা দোষ কি ?

৯

চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন আচ্ছা, তখন সবে মাত্র বছর দুই হল রেঙ্গুনে এসেছি। কৃপারাম শেঠের আদালতের কাজ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন এড্ভোকেট ব্যানার্জী সাহেবের আপিসে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। ঐখানেই নিতাইএর সহিত আমার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তার চেহারাটি মন্দ ছিল না। কথা ও স্বভাব ভদ্র রকম বলেই মনে হতো। দেশছিল তার ঢাকা শহরের মধ্যে একটি মহল্লায়। পেশা-দালালি, আর তার সাংসারিক অবস্থা দেখতাম স্বচ্ছল। নিতাই আমার কাছে সর্বদা তার উপার্জনের ও কর্ম্মদক্ষতার বড়াই করত, অবশ্য বেশ বিনয় ও ভদ্রতার সহিত। কোনদিন এসে বলত আমাকে—জানেন রায় মশাই, আজ রামদাস বাবুর বাগানটা লক্ষ্মীনারাণ সুরেখাকে বেচে দিলাম, কোন দিন খবর দিত "মোরাদ বক্স সাহেবের জামাই ইউসুফ মিয়ার ৩২নং গলির ঐ তেতলা বাড়ীটার দর দিয়েছিল আশি হাজার, অনেক-দিন অনেক খাটুনি ও আনাগোনার পর আজ জামাল ব্রাদারস্'দের সাথে বাহাত্তরে ক্লোজ করে এলাম।"

—বললাম, তবে ত মোটা রকম দালালিটা মারলেন।

—আর দাদা ছমাস ধরে এর পেছনে লেগে থাকতে হয়েছিল তা জানেন না ত?

—জানি কিন্তু এক কিস্তিতেই ছমাসের রোজকার ঘরে ঢোকালেনত? নিতাই একটু ফিকে হাসি হেসে চলে গেল।

পরের সপ্তাহে নিতাইকে দেখলাম রেজিষ্ট্রী আপিসের সামনে, জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে নিতাইবাবু খবর কি, এখানে যে?

—আজ সেই জামাল ব্রাদার্সদের কোবালাখানা রেজেষ্টারি হয়ে গেল।

—বললাম মোটা অঙ্কের চেকখানা পকেটে করে সরে পড়লে ত চলবে না, নিতাই বাবু, আমাদের একটা ভোজের ব্যবস্থা করুন।

—সেটা আর এমন কি বড় কথা, সেত আমার ভাগ্য, যখন বলবেন তখনই আমি প্রস্তুত।

একদিন দেখি নিতাই একখানি দামী ল্যাণ্ডো গাড়ীতে একজন সুরাটী ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাসার সামনে দিয়ে চলেছে। চোখোচোখি হতেই হেসে একনম্বর মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট দিয়ে গেল। পরের দিন আবার দেখা হতেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই রিপোর্ট দিলে—কাল তখন যাচ্ছিলাম মূসা আরিফের সংগে; আলোনেতে ছোকরা অনেক টাকা ফেলে বড় স্কেলে একটা ইরিটেটেড্ ওয়াটার ফ্যাক্টারি (সোডা ও মিঠে জলের কারখানা) বসিয়েছে, কিন্তু ভাল করে চালাতে পারছে না। পারবে কি করে বলুন না, একে বড়লোকের আদরের দুলাল, তায় আবার ইয়ার মানুষ!

ডাক্তার পাটেলের ঐ কারখানা কেনবার ভারি ঝোঁক আছে, আমায় বলেছেন,—বশাক, ঐটা আমায় সুবিধা দরে কিনিয়ে দিতে পারলে ও পক্ষ থেকে তুমি যা পুরা দালালি পাবে তার উপর তোমায় আমি চার ফিগার দিতে রাজি আছি। কাল ত দেখিয়ে এনেছি, দেখি মা দুর্গা কি করেন!

এইরূপ নানা রকমে নিতাইচরণ তার নিজের উপার্জনের ও দক্ষতার বিজ্ঞাপন আমার কাছে জারি করত। অস্বীকার করব না, বসন্ত, সে আমার উপর এই রকমে বেশ একটু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। আমার বয়সটা তখন ত কাঁচা ছিল কি না।

একদিন সকালবেলা উঠে সবে মাত্র টুথ্ ব্রাসটা হাতে নিয়েছি, সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি নিতাইবাবু কাছা গলায়, খালি পা। তাড়াতাড়ি নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্যাপার কি নিতাই বাবু এ বেশ কেন?"

—বাবা মারা গিয়েছেন, এই দেখুন টেলিগ্রাম।

—কত বয়স হয়েছিল তাঁর?

—তা তিনি বয়সেই গেছেন, প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হবে। আমি বড় ছেলে, আমায় দেশে গিয়ে তাঁর কাজ করতে হবে; না পারলে আমাদের সমাজে সেটা বড় নিন্দের কথা হবে। তাই আপনার কাছে এলাম।

—অর্থাৎ?

—দেখুন বাঙালীদের মধ্যে আপনার বাসাই আমার বাড়ীর সব চেয়ে কাছে। আমি এখানে আমার স্ত্রী ও মেয়ে দুটকে রেখে যেতে চাই, এখন তাদের সংগে নিয়ে যাওয়া সুবিধা হবে না। তাই আমি যতদিন না ফিরে আসি, আপনাকে দয়া করে তাদের একটু দেখা শোনা করতে হবে। আমার বাসায় ঠাকুর চাকর থাকবে, আপনাকে কেবলমাত্র অভিভাবক হয়ে, বিপদ আপদে যদি দরকার হয়, একটু দেখা শোনা ও সাহায্য করা আর কি। পরে হাত জোড় করে—"না বললে চলবে না চন্দ্রবাবু, আমি যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবো জানেন ত অনেক কাজ ফেলে যেতে হচ্ছে।"

—বশাক বাবু, আমি সামান্য লোক, আমার দ্বারা কি সাহায্য হবে?

—না না, আমি মিঃ ব্যানার্জীর মুখে শুনেছি, আর যে কদিন আমাদের আলাপ পরিচয় হয়েছে দেখছি আপনি একটি খাঁটী ভদ্রলোক।

—বেশ, কবে আপনি রওনা হচ্ছেন?

—অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে। হাতের কাজগুলির ব্যবস্থা করে তবে

ত যেতে পারব। তার উপর আবার জাহাজের প্যাসেজ পাবার ডিফি-ক্যাল্‌টী, (অসুবিধা) আছে।

—আপনি যদি দিন ঠিক করে বলতে পারেন, প্যাসেজ পাবার জন্য আমি আপনাকে কিছু সুবিধা করে দিতে পারি। ওখানকার বড় সাহেব মিঃ স্মিথের সংগে আমার একটু জান্‌-পহ্‌ছান্‌ অর্থাৎ জানাশুনা আছে।

—ধন্যবাদ ধন্যবাদ, তাই করবেন একটু দয়া করে!

১০

নিতাই দেশে চলে গিয়েছে। প্রতিদিন সকাল বিকাল আপিসে যাবার ও ফেরবার রাস্তায় তাঁর বাড়ীর খবর নিয়ে আসি, এই রকমে প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যার সময় খবর নিতে গিয়ে মহারাজ—হিন্দুস্থানী রাঁধুনি বামুনের কাছে শুনলাম—মাইজীর বহুত্‌ বোখার—"জোর জ্বর ও বেহুঁশ অবস্থা"।

আমি এত দিন পর্যন্ত সামনের রাস্তা থেকেই খবর নিতাম, কোন দিন বাড়ীর ভিতর ঢুকি নাই। বললাম ডাক্তার বাবুকে ডাকা চাই ত। এ বাড়ীতে কোন ডাক্তার দেখেন?

—ডাক্তার দে বাবু।

ডাক্তার চুণীলাল দে, আমার ও নিতাই উভয়েরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ঐ সময় আমি ডাক্তার বাবুর অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম।

ডাক্তার দে কে সঙ্গে নিয়ে আজ প্রথম আমি নিতাই বাবুর বাড়ীর ভিতর মহলে ঢুকলাম। রোগী দেখে ডাক্তার বাবু মুখ ভার করে, বাহিরে এলেন; বললেন "চন্দ্রবাবু রোগ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে, আজ মাথায় আইস ব্যাগ আর যে অষুধটা পাঠিয়ে দেবো তাই চলুক। কাল সকালে দেখে ঠিক বোঝা যেতে পারে।

ডাক্তারের ভাব ও কথা আমার যথেষ্ট ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

রাত্রি একটা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আহার নিদ্রার দফা রফা !

সকালে প্রথমেই গিয়ে দেখলাম, রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তখনি গিয়ে ডাক্তারকে অবস্থা জানালাম। বললাম ডাক্তার বাবু রোগটা যে কি তা বোধ হয় এইবার কতকটা বোঝা যাচ্ছে। বাঁচা মরা কারুর হাতে নেই, কিন্তু এখন কঠিন সমস্যা এদের দেখা শুনা করে কে। শক্ত রোগ তাতে আবার স্ত্রীলোক, তারপর আবার দুটি শিশু। প্রথমে এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার দে, অত্যন্ত ধীর স্বভাবের লোক, বললেন ব্যস্ত হবেন না চন্দ্রবাবু বসুন, আমি একটি লোকের চেষ্টা দেখছি, পরে তাঁহার মাদ্রাজী কম্পাউণ্ডার বালকৃষ্ণকে ডেকে কি বলে দিলেন। আমায় বললেন চলুন এইবার একবার রোগী দেখে আসা যাক্।

দু ঘণ্টা পরে ডাক্তারবাবু একটি মাদ্রাজী আয়াকে পাঠাতে পেরেছিলেন। সে সামান্য হিন্দী বলতে ও বুঝতে পার ত।

১১

এদিককার যথা সম্ভব বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজের কাজে আপিসে যেতে হলো কিন্তু মন এত অস্থির যে কিছুতেই কাজে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। তুমি ত জান আমাদের আপিস সংক্রান্ত একটি বড় ছাপাখানা ছিল। আপিস বাড়ীর সমস্ত একতলাটায় ঐ ছাপাখানা। দোতলার রাস্তার সামনের অংশে আপিস আর পিছন অংশে ম্যানেজার-ফোরম্যানের কোয়ার্টার। তিনতলায় কর্মচারীদের মেস্।

ছাপাখানার নানা রকমের হাতের কাজ আমার বড় ভাল লাগত, অবসর সময়ে—অবসর আমি যথেষ্ট পেতাম, তাই আমি শখকরে

ছাপাখানার লোকদের নিয়ে ঐ কাজের কোন না কোনটাতে লেগে যেতাম, তাদের সংগে কালি-ঝুলি মাখতাম, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজের কতকটা শিখেও নিয়েছিলাম। এমন কি বড় প্রিন্টিং মেসিন, —ছাপার বড়কল পর্যন্ত খাটাতে পারতাম। এখনও তা পারি বসন্ত, কোন নূতন রকমের মেসিন আমদানি হলে এখনও কেউ কেউ আমার সাহায্য নেয়। তখন মতলব ছিল হাতে টাকা পেলে নিজেই একটা প্রেস করে স্বাধীন ভাবে চালাব।

মনস্থির করবার জন্য হয়ত বা অন্যমনস্ক হবার জন্য নীচে নেমে ছাপাখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সাদা কাগজ যে কলে রূল করা হয় তাকে বলে রূলিং মেসিন। এই মেসিনের সারির মধ্যে ঢুকতেই একটি লোক দাঁড়িয়ে উঠে বাঙালী কায়দায় আমায় নমস্কার জানালে। আমি প্রতি নমস্কার করা মাত্র, সে জিজ্ঞাসা করলে—আজ আপনার শরীরটা কি ভাল নেই বাবু?

আমি তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, তার কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করলাম, তাকে বললাম কেন বলত?

—আপনার মুখ আজ বড় শুকনো দেখাচ্ছে, চোখ লাল, এমন ত কোন দিন দেখি না বাবু।

—তুমি আমায় রোজ লক্ষ্য করে দেখ না কি?

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে লোকটি বলতে লাগল—"তা দেখি বাবু। এ দপ্তরি ডিপাটে,—(ডিপার্টমেণ্টে) আমি একজন মাত্র হিন্দু বাঙালী আছি, চাটগাঁইয়াদের মেসে থাকি, তাদের বার আনা রকম কথা বুঝতে পারি না। আপনাকে দেখে অবধি দুটো দেশের কথা কবার বড়ই ইচ্ছা হতো, কিন্তু এতদিন আলাপ করতে সাহস পাই নি। আজ আপনার শুক্না মুখ দেখে আর থাকতে পারলাম না। কোন অপরাধ করলাম কি আপনার চরণে?

—আরে না, না, কিছুমাত্র না। আমি বরং খুসি হলাম তোমার সংগে আলাপ করে। তোমার নামটি কি বাপু?

—রামলাল মাঝি, আমরা জাতিতে মাহিষ্য, পৈত্রিক বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায়, এখন চব্বিশ পরগণা। আপনার কোন দরকার হলে আমায় হুকুম করবেন বাবু। আমার ক্ষমতা অল্প হলেও গতরে কিছু করতে পারবো ত।

—গতরে সাহায্য পাবার আমার আজ বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে রামলাল, তুমি সন্ধ্যার পর আমার বাসায় যদি আসতে পার, আমি তোমায় তখন সমস্ত কথা জানাব।

—নিশ্চয় আসবো হুজুর।

১২

রাত্রি প্রায় আটটার পর রামলাল হাজির হল আমার বাসায়। তাহারই জন্য আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম আমি। ছাপাখানায় তার পরণে ছিল একটি ঢিলা কোট, তাই তখন তার শরীরের গড়নটা ঠিক বুঝতে পারি নি। এখন তার গায়ে খাট হাফ. হাতা মিরজাই জামা, মাথায় গামছাখানি পাগড়ীর মত জড়ান, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি এক গাছি। শরীরে মাংসের অভাব হলেও দেখে মনে হয় হাড়গুলি ভাল রকম মজবুত। আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল।

তাকে আসতে দেখে আমার ভরসা হল, বললাম এই যে এসেছ রামলাল, ঐ মাদুরটা বিছিয়ে বসো। রামলাল কিন্তু খালি কাঠের মেঝেতে বসে পড়লো। আমি সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা তাকে বললাম, আর দেখে মনে হল সেও আমার কথা বেশ মনযোগ দিয়ে শুনছে। সব কথা শুনে সে বলতে লাগল—ভাল কাজই করেছেন বাবু,

মানুষ জনম গেরণ করে এমন বিপদে যে না সাহায্য করে তার জন্মই বৃথা। সে ঠিকানাটা কোথায় বাবু?

—কাছেই রামলাল ৪৪নং গলির এই ব্লকেই। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, নয়ত এতক্ষণ চলে যেতাম সেখানে। আমাকে হয়ত আজ সেইখানেই রাত কাটাতে হবে।

—বেশত এখনই যাওয়া যাক্ না।

১৩

গিয়ে রোগীর অবস্থা, যা দেখলাম সে আর কথায় প্রকাশ করা যায় না—চিৎকার প্রলাপ খেঁচুনি, উঃ সে কি যন্ত্রণা। অতি বড় পাষণ্ডও স্থির হয়ে তা দেখতে পারে না। আমি ত দু তিন মিনিট মাত্র থেকেই বেরিয়ে এসে বাইরের রকে বসে পড়লাম।

প্রায় দশ পনর মিনিট পরে রামলাল এসে বললে "বাবু সুবিধা নয়, তবে আজ রাত্রে কিছু হবে না বোধ হয়, এই ভাবেই চলবে।

—বল দেখি এখন কি করা যায়, রামলাল?

—কি আর করা যাবে, যা করবার তার সবইত হচ্ছে বাবু—ডাক্তার আনা হয়েছে, ওষুধ চলছে, বরফ দেওয়া হচ্ছে—আর কি করতে পারি আমরা? আর এক কথা আজ রাত্রে আপনাকে আমি এখানে কিছুতেই থাকতে দেবে না বাবু।

—সেও কি হয়, আমি না থাকলে কে থাকবে?

—বাবু আপনি বড় ঘরের ছেলে, আপনার সুখের শরীর, এখানে এই ভাবে থাকলে, এখনই অসুখে পড়ে যাবেন। আপনি খাড়া না থাকলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে। পরে হাত জোড় করে মিনতির সুরে—"আমার কথা শুনুন বাবু!

—আর তুমি ?

—আমার কথা ছেড়ে দিন। তার লাঠি গাছটি দেখিয়ে—এই বাঁশের ডগলা গাছটা আর এই গামছা গোটা হাতে নিয়ে, আপনার রামলাল তিন দিন তিন রাত বনের কোঝো কুল ও বাঁধের জল খেয়ে মেঠোপথ হেঁটে বেঁচে এসেছে, এটা পরীক্ষে হয়ে গেছে বাবু।"

সে কি রকম রামলাল ?

—সে অনেক কথা, এখন বলবার মত সময় নয় ত ; একদিন সুবিধে মত, অনুমতি করলে শ্রীচরণে নিবেদন করা যাবে'খন বাবু।

রামলালের কথা শুনে, তার মুখে সরল ও স্নেহপ্রবণ ভাব দেখে আমার চোখ সজল হয়ে এল। সেই অন্ধকারের মধ্যে জোড়হাত কপালে তুলে, প্রার্থনা জানাতে লাগলাম "সচ্চিদানন্দময়ী তারা, মা তুমি সব জিনিসের মধ্যে দুটো দিক করে রেখেছ, অন্ধকারময়ী দুর্যোগের রাত্রে ঘন কাল মেঘের বুকে বিদ্যুতের আলো ফুটিয়ে দিশাহারা পথিককে পথের নির্দেশ করে দাও, আবার ক্ষণপরেই নিজরূপ পরিবর্তন করে প্রভাত রবিকরোজ্জল নির্ম্মল আকাশ তোমার মধুর হাসিতে ভরিয়ে তোলো, ভীষণ মরু প্রান্তরের মধ্যে ওয়েসিস, (মরু উদ্যান), সুদূর সমুদ্র পথের মধ্যে সুন্দর দ্বীপপুঞ্জ মাগো তোমারই সৃষ্টি। সাধু মহাত্মারা বলেন যে তোমার দয়া, মানুষের প্রাণ ও হাত বয়ে পরস্পরকে ধন্য করবার জন্য ভেসে আসে—"নরের রূপেতে দেবতা আসেন দেবতা করতে নরে।" তোমার দয়া হঠাৎ শূন্য হতে ঝরে পড়ে না মা, তুমি জীবের দ্বারাই জীবের সৃজন পালন ও নিধন করাচ্ছ। আজ আমার এই বিপদের দিনে এ কি রূপ ধরে সন্তানের সাহায্যে হাত লাগাতে এলি মা করুণাময়ী ?

১৪

পর দিন রাত্রি প্রায় আটটা, দু ঘণ্টা আগে সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হলেও পরিস্কার তারা ভরা আকাশের আলোতে পথঘাট অস্পষ্ট ছিল না। আট দশ জন শববাহী যুবক আমরা ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত দেহে চলেছি। শহরের হাতা ছেড়ে মাঠের রাস্তা ধরে আরও দেড় মাইল যেতে বাকী। সামনে পুলিশ পাহারার গুমটী। পাঞ্জাবী পুলিশ ম্যান হাঁক দিলে—"হু কাম দার" (who come there) কারা যায়?

—উত্তর দিতে হলো আমরা শ্মশানে মূর্দা নিয়ে যাচ্ছি।

—পাস?

—পিছে আসছে।

বাঙাল অক্ষয়দার উপর পাশ কাটিয়ে আনবার ভার দিয়ে আসা হয়েছিল।

পুঃ ম্যাঃ। পাস না দেখালে মূর্দা ছাড়বার হুকুম নেই বাবুজি।

তাকে বুঝান হল যে আমরা অনেকেই সরকারি আপিসের কর্মচারী, রাত্রের মধ্যে একাজ শেষ না করতে পারলে কাল আপিসের দেরি হবে, আর তাতে সরকারি কর্মের ক্ষতি হতে পারে। এ সব কথা হিন্দিতে চল্‌ছিল।

পুঃ ম্যাঃ। আমি সব সমজেছি বাবু সাব্। আপনাদের মধ্যে সর্দার কে আছে?

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগ্‌লাম পরে আমি বললাম—"আমি সরদার"। সত্যই ত আমি আজ এ কাজের জন্য সকলকে ডেকে এনেছি।

তখন পুলিশ ম্যান পরামর্শ দিল যে সর্দারজীকে আমার কাছে জামানৎ—জামিন রেখে বাকি সকলে মূর্দানিয়ে আগে চলে যেতে

পারেন তাহলে শ্মশানে গিয়ে ওখানকার কাজ এগিয়ে রাখতে পারবেন। তবে একথাও ঠিক যে পাস না দেখান পর্যন্ত সুপরিন সাব্ মুর্দা জ্বালাতে দেবে না।

পুলিশম্যানের পরামর্শমত লাস নিয়ে অপর সকলে এগিয়ে চলে গেল। আমি সেই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কাল্‌ভাটের উপর বন্দী অবস্থায় পুলিশের পাশে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম এই ত মানুষের জীবন। এই মানুষটা বেশ ঘরকর্না করছিল, স্বামী সন্তানদের রেখে চিরদিনের জন্য কোথায় নিরুদ্দেশ হল, কিছুতেই কোনো রকমেই আর ইহার সাড়া পাওয়া যাবে না। তবে কি জন্য দেশ ঘর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এই নির্বান্ধব বিদেশে পড়ে আছি আমি?

শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল প্রাণকৃষ্ণ রায় বৈকুণ্ঠ রায়ের অন্নে পুষ্ট হয়ে তাঁরই বংশের সর্বনাশ করে বেশ চালাচ্ছে। না—না—নাঃ তা হতে দেওয়া হবে না। আমার মনের তার উঁচুসুরে বেঁধে রাখতে হবেই হবে। শান্তি স্বস্তির স্থান এখানে থাকবে না।

আধঘণ্টা, একঘণ্টা কেটে গেল অক্ষয়দার দেখা নাই, আরও আধঘণ্টা, তখন একজন, সম্ভবতঃ পুলিশ সাবইনিস্পেক্‌টার হতে পারে, ঘোড়ায় চড়ে রাউণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। সকল কথা শুনে তিনি বললেন—হাঁ আমি আসবার সময় পথে একজন বাঙালী বাবুকে আলো হাতে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি ক্রিমেসন পাস নিয়ে পিছনে আসছেন, তাঁর পাস নম্বর আমি আমার নোটবুকে লিখে নিয়েছি, নাম কি যেন, মিসেস্ বশাক না?

—হাঁ ঠিক তাই।

—আপনি এখন নিজের কাজে যেতে পারেন।

—বিশেষ ধন্যবাদ। আমি এই অন্ধকার রাত্রে একলা যাওয়া

নিরাপদ মনে করি না। আমার বন্ধু যখন পাস ও আলো নিয়ে একটু পরেই আসছেন, তখন এক সঙ্গে যাওয়াই সেফ্ মনে করি, তাই নয়কি ?

—"সেই ভাল পরামর্শ বোধহয়" বলে ইনিস্পেক্টর নিজের কাজে চলে গেলেন।

———

১৫

পরদিন সকালবেলা সমস্ত শরীরে ব্যথা পাশ ফিরে শুতে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হবার মত বোধ করছিলাম, মাথার যন্ত্রনাও ভারি জোর। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রামলাল এসে জিজ্ঞাসা করছে—শরীরটা কেমন বোধ করছেন বাবু, ডাক্তার বাবুকে একবার ডেকে আনি? আমি তাকে ভরসা দেবার জন্য বলছি—তেমন কিছু নয় রামলাল। ডাক্তার ডাকবার এখন দরকার নেই।

বেলা একটা নাগাত একটা মোটা রকম বমি উঠে গেল। তার পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম কি জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে গেলাম তা বলা যায় না। পরে শুনেছি, বাকী সমস্ত দিন ও রাত তেমনই অঘোর অবস্থাতেই কেটেছিল। এর মধ্যে রামলাল দুবার ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল আর সারা দিনরাত আমার পাশে বসে কাটিয়েছে।

যখন আমার হুঁস হল দেখলাম সকালের আলোতে ঘর ভরে উঠেছে। কাছে কাকেও দেখতে না পেয়ে ডাকলাম—কে আছ? দরজার বার থেকে চৌবে ঠাকুর তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে—"কি চাই বাবুজী? রামলাল রাত ভোর আপনার কাছেই হাজির ছিল। এক ঘড়ী হুয়া, আমাকে দরজায় পাহারা রেখে বলে গেছে "জলদি ফিরে আসবে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যেন দরজা না ছোড়ি।"

এই কথা শেষ হতে না হতে ভিজে কাপড় হাতে একটি ছোট মাটির ভাঁড় ও কিছু ফুল বেলপাতা নিয়ে রামলাল স্বশরীরে উপস্থিত। নিজের মাথার ভিজে চুল থেকে জল নিয়ে মেঝেতে একটু জায়গা মুছে সেইখানে ভাঁড় ও ফুলগুলি নামিয়ে রেখে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ

আশ্চর্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে জানিনা প্রণাম করতে লাগল আর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

আমি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম কি হল হে রামলাল? সে সেই ভাবেই বলতে লাগল—"বাবু, আর যে আপনার কথা শুনতে পাবো সে ভরসা ছিল না। আপনার জ্বর বেড়ে যেতে, আপনাকে অজ্ঞান দেখে ছুটে ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনি, আবার রাত্রে তিনি নিজেই এসেছিলেন। বলে গেলেন ওষুধপত্র এখন কিছু দেওয়া হবে না। ওঁকে ঘুমুতে দাও, কিছুতেই যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।"

সমস্ত রাত বিছানার পাশে বসে রইলাম! সেই অবস্থায় আপনার মুখে কত' না পুরনো কথা শুনতে পেলাম। মা দুর্গাকে আকুল হয়ে ডাকলাম—বললাম মা! বাবুকে আমার বাঁচিয়ে দে মা, একটা বড় ঘরকে, একটা পুণ্যের সংসারকে নষ্ট হতে দিস্ নি মা! বেটী কিন্তু আমায় ফাঁকি দিতে পারল না, বাবু। বসে বসেই ভোর বেলায় একটু ঢুল এল, স্বপ্নে দেখলাম, আমাদের দুর্গাবাড়ীর পিরৃতীমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মা বলছেন কাঁদছিস্ কেন রে? ফুল চন্নামেত্ত নিয়ে গিয়ে বাবুর মুখে মাথায় দিয়ে দিগে যা, সব ভাল হয়ে যাবে।

"এসে আপনাকে ভাল দেখলাম ত?

রামলাল নিজের ঝোঁকেই বলে চলল—সকালে গিয়ে দেখি পুরুত ঠাকুর রকে বসে তামাক টান্‌ছে, বললুম ঠাকুর ওঠো, কাপড় ছেড়ে এখুনি আমায় মার চন্নামেত্ত আর পেসাদি ফুল দাও, নইলে রামলালকে দুর্গাবাড়ীর ত্রিসীমায় আর দেখতে পাবে না। ফুরিয়ে গেলেই আমি পুজোর জল তুলে দুটো জালা ভরে দিয়ে আসি কি না? তখন তবে উঠে এনে দেয়। নিয়ে এই ছুটে আসছি বাবু, এখন কেমন বোধ করছেন?

বিস্ময় মুগ্ধ আমি, মনে মনে ভাবতে লাগলাম—"পুণ্যের সংসার" "বড় ঘর" রামলাল এ সব বলে কি ? কিন্তু তখন আর কথা বাড়াতে সাহস হল না। বললাম—এখন ত শরীর মাথা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে, কোমরের ব্যথাটা প্রায় নেই বললেই হয়, ভালই আছি, রামলাল !

কাপড় এনে দিচ্ছি, আপনি কাপড় বদলে ফেলুন, বাবু।

রামলাল আমার মুখে চরণামৃত মাথায় ফুল ঠেকিয়ে বললে "মার মন্দিরের দিকে সুমুখ করে পেন্নাম করুন বাবু।" রামলালের হুকুম মানতেই হলো।

তখন মনে একটি বিচিত্র ভাবের উদয় হল—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ, এর মধ্যে একাধারে দেব ও দানব প্রকৃতির কি অদ্ভুত বিকাশ ও মিলন। ইহাতে ছোট বড় বিচার করবার কিছু নাই।

আজ রামলালই ত আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু, অথচ তখন পর্যন্ত সে আমার নিকট হতে কোন উপকার পায় নি। সত্য বলছি বসন্ত রামলালের সংগে পরিচয়ের দিনটিকে আমি আমার জীবনের একটি বিশেষ শুভদিন বলেই মনে করি।

এখনও ভাবি—রামলাল কে ? তার মধ্যে দিয়ে এ কিসের নির্দেশ, এ কার লীলা ?

১৬

নিতাই ফিরেছে, দেখা করে আমার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনেক কাঁদাকাটি অনেক ধন্যবাদ ইত্যাদি করলে। প্রায় প্রতিদিন সকালে আমার বাড়ীতে হাজিরা দিত ও নানা বিষয়ে আলাপ চালাত, তার মধ্যে বেশির ভাগ তার নিজের দালালির রোজগার ও তার বুদ্ধির কেরামতি।

একদিন এসে বললে, চন্দ্রবাবু, আপনি আমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করলেন, সত্য কথা আমি আমার সহোদর ভাইএর কাছেও এত বড় উপকার প্রত্যাশা করতে পারি না। দুর্ভাগ্য আমার, আমি ত আপনার কিছুই করতে পারলাম না।

—ঈশ্বর করুন নিতাই বাবু, আমার যেন ঐরূপ অবস্থায় উপকারের কখন আবশ্যক না হয়!

—নিশ্চয় নিশ্চয়, মাফ্ করবেন মশাই স্বপ্নেও আমি সে কথা কি মনে আনতে পারি! রামচন্দ্র! আমি আমার নিজের লাইনের কথা ভেবেই এ কথাটা তুলে ছিলাম। যেমন ধরুন কোন একটা সওদা করিয়ে আপনাকে কিছু টাকা যদি পাইয়ে দিতে পারতাম তা হলেও মনে কতকটা স্বস্তি পেতাম, আর কি?

—শুনি অনেককেই ত বেশ মোটা মোটা লাভ করিয়ে দিচ্ছেন, বেশ ত গরিবকে না হয় একটা চান্স্ করে দিলেন।

আচ্ছা ভাই আপনাকে আর বেশী কিছু বলতে হবে না। আমার হাতেই একটা ঝুলছে। বলুন দেখি আপনি কত টাকা মার্জিন দিতে পারেন?

—তার মানে?

—তার মানে এই যে একটা বড় কাজ না করতে পারলে মোটা রকম লাভ পাওয়া যাবে না ত। ধরুন যদি আপনাকে একটা অন্তত: দশ হাজার টাকার সম্পত্তি সুবিধামত কিনিয়ে দিতে পারি।

যেরূপ বাজার চড়্ছে, তাতে হয়ত দু তিন মাসের মধ্যে অন্তত: দু হাজার টাকা লাভে, সহজেই বেচে দিতে পারব, আশা করি।

—বলেন কি? কিন্তু আমি অত টাকা পাব কোথায়, নিতাই বাবু যে দশ হাজার টাকা দিয়ে সম্পত্তি কিনবো।

—তবে আর মার্জিনের কথা উঠালাম কেন? বুঝুন সম্পত্তির দাম হল দশ হাজার, আপনি নগদ দিলেন পাঁচ হাজার। বাকী পাঁচ হাজারের জন্য ঐ সম্পত্তি, পূর্ব মালিকের কাছে বন্ধক রাখব। পরে দু তিন মাসের মধ্যেই বার হাজারে যদি বিক্রি করতে পারি, যা আমি নিশ্চয় করতে পারব, তবে আপনার দু হাজার টাকা নিট্ লাভ রইল ত। এর মধ্যে আর একটা কথা আছে, যে কদিন সম্পত্তিটি আবার বিক্রি না হয় ঐ সময়টার জন্য মহাজনের সুদটা আপনাকে দিয়ে যেতে হবে। সে আর কতইবা হবে? তিন মাসে না হয় তিন শো' তা হলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে দেড়হাজার, শতেরশো টাকা রোজগার। এই করে সুরতি মহাজনরা প্রচুর উপার্জন করে ফেলছে মশাই। এই বলে নিতাই বাবু নিজের নোট বুকে অঙ্ক ফেলে আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে এই ভাবেই একটি বাগান জমি বার হাজার টাকা দাম ধার্য করে নিতাই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। ইহার মধ্যে আমি দু'হাজার টাকা মার্জিন দিতে পেরেছিলাম।

নিতাই এসে মাঝে মাঝে ভরসা দিয়ে যেত, এই করেদিচ্ছি আপনার কাজটা, আর বেশী দেরি হবে না ইত্যাদি। তিন মাসের জায়গায় ছ'মাস কেটে গেল, কিছুই হল না। বশাকের যাওয়া আসা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আর আমি আমার মাস মাইনের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ দিয়ে মহাজনের সুদ যোগাতে লাগলাম।

এই ভাবে ছমাস কাটবার পর সব দিকেই দেখি অভাব অভিযোগ মাথা তুলেছে। এমন কি বাসা খরচের পর্যন্ত অনাটন। দুর্ভাবনায় ও নিজের উৎসাহ ও চেষ্টার অভাবে, যে দু দশ টাকা উপরি রোজগার আসতো তাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

এমন সময় এক দিন শুনলাম—নিতাই চরণ তার বাসা বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানে জানা গেল বাড়ীওয়ালার চার মাসের

বাড়ী ভাড়া বাকী, শশিবাবুর মুদীর দোকানের মাসকাবারি টাকাও ক'মাস জমা হয় নি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপায়ন্তর না দেখে, আমি তখন নিজেই জাল কেটে বেরোবার চেষ্টায় লেগে গেলাম কিন্তু দু তিন মাসের প্রানপণ চেষ্টাতেও কিছু উপায় করে উঠতে পারলাম না। শেষে একদিন এড্‌ভোকেট ব্যানার্জী বাবুকে সমস্ত কথা বলায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—রাসকেলটা তোমাকেও ফাঁসিয়ে গেল! তুমি তার কত বড় উপকার করেছ সে ত আমি তার নিজ মুখেই শুনেছি গো, এই কি তার প্রতিফল? মহাজনের নাম শুনে বললেন ও লোকটা মানুষ মন্দ নয়, আমার একটু খাতিরও রাখে। দেখি তাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করে যদি কোন উপায় করতে পারি।

১৭

পরের দিন ব্যানার্জী বাবুর আপিসে মহাজনের সহিত দেখা। ইনি একজন এঙ্গলো বারম্যান ফিরিঙ্গি সাহেব; নাম পেড্‌লি। ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করাতে পেড্‌লি বললে মিঃ ব্যানার্জী এ বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই।

টাকার আবশ্যক হওয়ায় আমি বশাককে এই জমি বিক্রয় করতে ভার দিই আর জমির শেষ দর দশ হাজার নির্দিষ্ট করে দিই। অল্পদিন পরেই বশাক এসে আমার কাছ থেকে এই মর্মে এক পাকা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে যায়,—"যে দশ হাজারের উপর যে দাম পাওয়া যাবে সে টাকাটা তার ন্যায্য দালালির উপর তাকে অতিরিক্ত দিতে হইবে।"

আপনার নিশ্চয় জানা আছে মিঃ ব্যানার্জী যে, এসব কাজে এরূপ ব্যবস্থা এদেশে চলিত আছে। বার হাজারে যখন বিক্রী হল, আমি তাকে তার দালালি ও অতিরিক্ত মার্জিন দিয়ে আমার প্রাপ্য

দশ হাজারই পেয়েছি। প্রমাণ স্বরূপ এই আমার ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখুন।

অনেক বাদানুবাদের পর ব্যানার্জী বলিলেন "শোন পেড্‌লি এর একটা উপায় তোমায় করে দিতেই হবে। এই ভদ্রলোকটি আমার অত্যন্ত অনুগত, এ কথাটি জানিয়ে রাখছি তোমায়।

পেড্‌লি। মিঃ ব্যানার্জী আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলে, আমি যারপর নাই সুখী হবো। মধ্যে আর একদিন পেড্‌লি ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। তৃতীয়বার দেখা করতে এসে ব্যানার্জীর আপিস থেকে ফোনে পেড্‌লি আমায় খবর দেয় আমি সেখানে গিয়ে তাঁদের সংগে দেখা করি।

পেড্‌লি আমায় ও ব্যানার্জীকে এবার বললে—মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ রায়, আপনারা আমায় বিশ্বাস করতে পারেন আমি মিঃ রায়ের জমির দাম অনেক চেষ্টা করেও দশ হাজারের বেশী পেলাম না।

ব্যানার্জী। তাহলে রায়ের থোক দু হাজার টাকা লোকসান যাবে, ওর পক্ষে সেটা একেবারে মারাত্মক। আর একটু চেষ্টা করে দেখলে ভাল হয় না কি?

পেড্‌লি। আমার বিশ্বাস আমি আমার যথা সাধ্য করেছি। তা ছাড়া ধান খরিদ বিক্রীর সীজন (মরসুম) আরম্ভ হচ্ছে; এখন টাকা ধানের কাজেই সব আটকে যাবে। এ সময় প্রপার্টির ভাল দাম ত পাবার সম্ভাবনা নাই বরং কমবার সম্ভাবনা আছে কি বলেন মিঃ ব্যানার্জী?

আমি। আপনার কথায় আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় আমায় কি করতে আপনারা পরামর্শ দেন।

পেড্‌লি। আমি সব দিক বিবেচনা করে দেখছি এ লোকসান আপনার অনিবার্য। আঙুলে সাপে কাটলে, আঙুলটা কেটে বাদ দিয়ে প্রাণ বাঁচান কি যুক্তি যুক্ত নয়?

ব্যানার্জী। আমি তা ছাড়া আর কোন উপায় ত দেখছি না, চন্দ্র, যা গেছে সেত গেছেই। এখন এটা ছেড়ে দিলে প্রতিমাসে সুদের টাকা যোগান থেকে ত তুমি রেহাই পাবে?

কথাটি শুনে আমার বুকের মধ্যে বেদনা বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু পরক্ষণে দৃঢ়স্বরে বললাম, বেশ তাই হোক; আপনি দশ হাজারেই ক্লোজ করুন মিঃ পেড্‌লি!

"ব্যস, নিশ্চিন্ত আমার দেড় বছরের কঠিন পরিশ্রম দ্বারা সামান্য সঞ্চয় এক ফুঁয়ে উড়ে গেল! বলত বসন্ত, আমার সে অবস্থায় ঐ আঘাতটা বেশ একটু গুরুতর হবার কথা নয় কি? আমি চন্দ্রবাবুর মুখের প্রতি শুধু চাহিয়া রহিলাম মুখে কোন উত্তর যোগাইল না।

১৮

প্রতিদিন বিকালে রেঙ্গুণ নদীর ধারে সুদীর্ঘ জেটিতে বেড়ানই আমার অভ্যাস ছিল, এবং সেইখানে কতকগুলি পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত আমাদের দেখা ও আলাপ হত। সেদিন কেন জানিনা, কোন জানা বন্ধুলোকের সংগ আমার ভাল লাগছিল না।

ছুটির পর দক্ষিণ দিকে না গিয়ে সোজা উত্তর মুখে লেকের ধারে উপস্থিত হলাম। এই প্রসিদ্ধ কৃত্রিম হ্রদের এলাকায় "পাম অ্যাভিনিউ" তালী বীথিকা ধরে আনমনে চলেছি, মনের অবস্থা বিক্ষিপ্ত, ঠিক সুমুখে বিশ্ব বিখ্যাত "সুয়েডেগন" মন্দিরের স্বর্ণ চূড়ার পশ্চাতে অস্তমান সূর্যদেবের কিরণ রশ্মি চোখের উপর প্রতিহত হওয়াতে এগিয়ে চলবার পক্ষে বেশ একটু অসুবিধা বোধ করছিলাম। অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্তও যে হই নাই তাও নয়। একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে হ্রদের কালো জলের ঢালু কিনারায় সবুজ মসৃণ ঘাসের উপর বসে, পরে ঐখানেই শুয়ে

পড়ে, নির্জনে নিজের বর্তমান অবস্থার কথা নানাদিক দিয়া আলোচনা করছিলাম—কেন এমন হয়? "আমি আমার জ্ঞানে কাকেও ঠকিয়েছি বলে ত মনে হয় না ; তবে কি দোষে শনিগ্রহ আমার রন্ধ্রগত হলেন? কোন পথ ধরে কলিদেবতা আমার দেহে প্রবিষ্ট হলেন? যত সাবধানেই থাকি না কেন তবু বার বার এমন প্রবঞ্চিত হচ্ছি কেন? এই দুষ্টগ্রহই কি তবে আমায় দেশ ঘর, অতি স্নেহময় আত্মীয় স্বজন হতে বিচ্যুত করেছে? এত কষ্টের পরও কি অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে না? আমি প্রাণপণে যার উপকার করলাম সেই কি না আমায় সর্বস্বান্ত করে চলে গেল। এ থেকে বাঁচবার কি কোন পথ নেই?"

মনে পড়ে গেল নলরাজার কথা ; মনে পড়লো শ্রীবৎস রাজার কথা। তাঁরা বিনা দোষেই কষ্ট পেয়েছিলেন। কি করে তাঁরা এই গ্রহ কোপ হতে রক্ষা পেলেন? সংগে সংগে মনে হল একটি "কথামৃত" শিষ্টের পালনভার নিজে লইও কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।"

যতদুর জানা আছে, তাতে ত মনে হয় না, ঐ দুরবস্থা গ্রস্থ রাজারা তাঁদের অনিষ্টকারীদের প্রতিশোধ দিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়েছিলেন। বরঞ্চ রাজোচিত উদার স্বধর্ম হতে কোন অবস্থাতেই বিচ্যুত হন নাই। ক্ষমতা সত্বেও ক্ষমাদ্বারা শত্রুকে মুক্তি দিয়া তাঁদের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় রেখে গেছেন। এই গুণাবলীর জন্য তাঁরা ভগবানের পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হয়ে আশাতীত পুরস্কার লাভ করেন নাই কি?

আর আমি আমার অনিষ্টকারী প্রাণকৃষ্ণ রায়কে প্রতিশোধ দিবার চিন্তাকে ইষ্টমন্ত্রের মত মনে প্রাণে পোষণ করছি। এই প্রতিশোধ স্পৃহা আমার সকল চিন্তার সকল কার্যের সকল উৎসাহ ও চেষ্টার মূল উৎস, ইহা ফল্গু ধারার ন্যায় আমার সকল কর্মের অন্তরতম প্রদেশে

অলক্ষিতে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে না কি? সুযোগ সুবিধা পেলে প্রাণকৃষ্ণ কাকার সর্বনাশ করবার ইচ্ছা দমন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আজ যদি নিতাইকে হাতে পাই জেলের ব্যবস্থা না করে ছাড়ি কি? এইখানেই দেখছি আমার অপরাধ, এই ছিদ্রপথেই মন্দগ্রহ আমার রন্ধ্রগত হয়েছে নিশ্চয়।

এ প্রতিশোধ ইচ্ছাকে মন থেকে তাড়াতেই হবে। দুষ্টের দমনে আমায় অধিকার কোথায়? প্রাণকৃষ্ণ রায়! নাবালকদের আরও বড় বড় সম্পত্তি তোমার হস্তগত হক, তুমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ দখল করতে থাক, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। নিতাই তুমি নিতান্ত অভাব বশতঃ এই অপকর্ম করেছ, তোমার সুমতি হ'ক!

তখন সেই অস্তমান সূর্যালোকের পটভূমিকায় অদ্বিতীয় "সুয়েডেগন" —স্বর্ণচূড় বৌদ্ধ তীর্থের দিকে নত হয়ে বার বার প্রণাম করতে করতে বলতে লাগলাম—"আজ আমি করুণার সাগর ক্ষমার হিমাচল ভগবান শ্রীশ্রীগৌতম বুদ্ধদেবের পবিত্র মন্দির সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি,—আমার সকল অনিষ্টকারীরা,—তোমাদের সর্বান্তকরণে ক্ষমা করলাম। জগদীশ্বর তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমাদের মঙ্গল করুন!!

বেঁচে গেলাম বসন্ত! আজ আমার কাছে আর কারও কোন দোষ রইল না। বেশ বুঝতে পারলাম, আমার অনিষ্টের মূল এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। পুনঃ পুনঃ বিপদ পাত নিবারণের একমাত্র পন্থা কায়মনোবাক্যে ইহাকে উচ্ছেদ করা! দেখা যাক্ বিধাতা এবার আমায় কোন পথে নিয়ে যান?

আমার এই সরল ও ঐকান্তিক প্রার্থনা সেদিন ভগবানের চরণে পৌঁছেছিল, বসন্ত। পরদিন হতেই আমার ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, তখন থেকে কাজের জন্ম আর আমায় চেষ্টা করতে হতো না, কাজই আমায় খুঁজে বার করত।

এতে এই বোঝা যাচ্ছে যে, অপরের, এমন কি শত্রুর প্রতিও অনিষ্ট চেষ্টা নিজের প্রভুত অনিষ্টের কারণ হয়। প্রতিহিংসা পরায়ণ জনের উপর ভগবানের শুভদৃষ্টিপাত যে হয় না ইহা ধ্রুব সত্য।

বেশ শান্ত ও স্থির মন নিয়ে সে রাত্রে বাড়ী ফিরলাম সামনেই রামলালকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—আজ খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হলো গো তোমাদের? রামলাল সবিস্ময়ে বোধহয় ভাবলে—বাবুকে কখনও এ সব বিষয়ে খোঁজ করতে শুনিনি ত।

—কেন বাবু, আজ কি বাইরের কোন লোক এখানে খাবেন?

—না না এমনিই বলছি। জিজ্ঞাসা করছি রামলাল।

—বেশ বুঝতে পারলাম, রামলাল যেন একটু সন্দিগ্ধ চোখে আমায় লক্ষ্য করছে।

৯৯

পরের দিন সকালে উঠে মনস্থির করে আবার নূতন কাজকর্মের একটা মোটামুটি ছক তৈয়ার করতে বসে গেলাম। প্রথমেই ড্রয়ার থেকে ব্যাঙ্কের খাতা বার করে দেখা গেল সেখানে এখন জমার খাতে ৩৫৭৲ তিন শত সাতান্ন টাকা পাওয়া যেতে পারে। সামান্য এই সম্বল নিয়ে কোন পথে কি হতে পারে? বেলা দশটার মধ্যেই মোটামুটি তা স্থির করে ফেললাম:—

(১)	জরুরী কাজে দেশে ফিরিবার পথ খরচ—	১০০৲
(২)	৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার জীবন বিমার প্রিমিয়ম—	১৫৫৲
৩)	বাকী হাতে থাকে মাত্র—	১০২৲
		৩৫৭৲

চন্দ্রকান্ত রায়! এই যৎসামান্য মূলধন নিয়ে আবার তোমায় নূতন ছকে ঘুঁটী চালতে হবে, নূতন করে খেলা দেখাতে হবে। কেন হবে না? কেন পারা যাবে না? মনে করে দেখ যে দিন জাহাজ থেকে রেঙ্গুণে প্রথম নেমেছিলে পকেটে একটি গোটা আধুলি মাত্র সম্বল ছিল, বয়স জ্ঞান বুদ্ধি আরও অল্প ছিল। দেশ কাল পাত্র ভাষা এ সবই ছিল তোমার অজ্ঞাত। তাতেও এতদূর চালিয়ে আনতে পেরেছ, আজ পারবে না কেন? অন্তরে ভগবান, বাইরে তাঁহারই দেওয়া বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে যাও কার্য ক্ষেত্রে।

বসন্ত, যখনই দেবতা সাক্ষী করে আমি আমার অত্যাচারীদের আন্তরিক ক্ষমা করলাম, সেই মুহূর্ত হতেই বোধহয় শনিগ্রহের কোপ দৃষ্টি তাঁর শুভ দৃষ্টিতে পরিনত হয়ে গিয়েছিল। কারণ এবার প্রথম হতেই লাভের কাজ আমার খুঁজে বেড়াতে হল না, কাজই আমায় খুঁজে আসতে লাগল। তার দু'একটা দৃষ্টান্ত শুনলে তুমি হয়ত আমার একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে।

২০

প্রথম দিন দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরিয়েছি, রাস্তার মোড় ঘুরতেই শহরের শীর্ষস্থানীয় ধনিপুত্রের খানসামার সঙ্গে দেখা। সেলাম বাজিয়ে বললে—রায় সাহেব, আমার সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন, বহুত জরুরী কাম আছে।

—কে, ইব্রাহিম সাহেব?

—জী, হাঁ।

—চল।

গিয়ে দেখলাম ইব্রাহিম সাহেব উৎকণ্ঠিতভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন, আমার হাত ধরে তাঁর ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন—"দেখুন রায় সাহেব আমার একটি অত্যন্ত বিশ্বাসের ও জরুরী কাজের জন্ত আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।"

—কি কাজ আদেশ করুন।

তখন ইব্রাহিম সাহেব কিছু নিম্নস্বরে বল্‌তে লাগলেন—এখন বেলা ন'টা, আজ বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমায় পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করে দিতে হবে। আমি এই টাকার সিকিউরিটির জন্ত একখানি মূল্যবান জহরত বন্ধক রাখবো। কিন্তু কাজটি গোপনে করা চাই কারণ এই জিনিসটি আমার মৃত ওয়াইফের—স্ত্রীর একমাত্র নাবালিকা কন্তার জন্ত আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এটি পর হস্তগত হয়েছে প্রকাশ পেলে অত্যন্ত লজ্জার কথা হবে এবং সংসারে গুরুতর বিপ্লব সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়তঃ এমন ভদ্র ও বিশ্বাসযোগ্য লোকের হাতে রাখতে হবে যাঁর দ্বারা এ জিনিসটির কোনরূপ ক্ষতি খেসারত না হয়।

তিনি উঠে দেরাজের টানা হতে মখমলের বাক্স সমেত একছড়া হীরার নেক্‌লেস্‌ এনে আমার হাতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার মতে এর দাম কত মনে করেন, সাহেব ?

—আমার মতে নয়, ইহার অরিজিনাল্‌ ভ্যালুয়েসন সার্টিফিকেট ঐ বাক্সের মধ্যে আছে দেখে নিন। আমি বললাম—এত অল্প সময় দিচ্ছেন, কাজটিও কঠিন বলে মনে হচ্ছে, আমি কি এই সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারব মনে করেন ? এ কাজের উপযুক্ত দুটি মাত্র ঘর আমার জানা আছে, আপনি হুকুম করলে এখনিই আমি তাঁদের ওখানে চেষ্টা করতে পারি।

—আপনিই পারবেন, অন্ত কাহারও দ্বারা সেরূপ হবে না। আমি দাউদজীর নিকট শুনেছি, আপনি তাঁর অনেকগুলি এইরূপ বিশ্বাসের কাজ করে দিয়াছেন। আমার হাতে বাক্সটি দিয়া বললেন—

আমার গাড়ি তৈয়ার আছে ; আজ সমস্ত দিন, আবশ্যক মত আপনি ইহা ব্যবহার করতে পারবেন।

২১

প্রথমেই কৃপারাম শেঠের গদিতে গিয়া তাঁকে জিনিসটি দেখিয়ে সকল কথা বললাম। তিনি একটু হেসে বল্‌লেন—সকালেই একটা বড় রকম শিকার মেরেছ দেখছি যে, রায়।

—আমার আর শিকার কি স্যার ? ভদ্রলোকের অনুরোধ। শেঠজি রাগতঃ স্বরে বলে উঠলেন—ও সমস্ত ভদ্রতা চোতা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দাও গে। বিনা লাভে বহুমূল্য সময় নষ্ট করা নির্বোধের কাজ, কোনদিন তুমি অভাবে পড়লে ঐ ইব্রাহিম সাহেব তোমার দিকে ফিরেও চাইবেন না সেটা জেনে রাখ। এই বয়সে এরূপ অনেক ঘটনা আমার জানা আছে।

এখন যা বলি করে যাও। প্রথম যাও গুনামল বাবুর দোকানে, আমি তাঁকে ফোন করে দিচ্ছি, জিনিসটি যাচাই করে আন।

—যাচাইএর সার্টিফিকেট উহার সংগেই ত রয়েছে শেঠজী।

—দেখেছ ঐ সার্টিফিকেটের তারিখ ? এই ক'বছরে কত কি হতে পারে জান ? মাঝে কেউ হয় ত দু'দশখানা আসল হীরে খুলে নিয়ে অল্প দামের পাথর বদল করে রেখেছে, এসব কাজে অনেকস্থলে এরূপ হতে দেখা গিয়াছে।

যাচাই করে জানা গেল বর্তমান বাজারে ঐ জিনিসটির দাম বার হাজার টাকার উপর হবে। শুনে শেঠজী বললেন—দেখছ রায় এই কয় বছরে হীরের দাম কত চড়ে গিয়েছে, পরে ঠাট্টাচ্ছলে—কিছু কিনে রাখতে পারলে বেশ মোটা রকম লাভ করতে পারতে।

—আমার লোহা কেনবার সামর্থ্য নাই শেঠজী হীরে কিনব কোথা হতে, বলুন ?

—আরে, লোহা যে তোমার হীরের চেয়ে বহুত দামী চিজ্ সংসারের লালন পালন শাসন সব কাজে লোহা না হলে চলবেই না। পরে তোমায় একদিন বুঝিয়ে দেবো লোহা ধরে ব্যবসা করা, হীরে রেখে ব্যাপার করা অপেক্ষা কত কষ্টসাধ্য ও কঠিন কাজ।

একটি ছোট টুকরো কাগজে কি লিখে নেক্‌লেসের সহিত ভেলভেট্ বাক্সর মধ্যে রেখে দিলেন। পরে পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক্ ও একখানি চিঠি লিখে আমায় দিয়ে বললেন—যাও রায় সাহেব তোমার বন্ধুকে চেক্ দিয়ে এই চিঠি সই করিয়ে আন।

বললাম আমার নামে চেক্ কাট্‌লেন কেন ?

তোমার বন্ধু গোপনে কাজটা করতে বলেছিলেন না ? তা ছাড়া লাভটা যখন পাবে তুমি, আর চেক্ কাটব কি আমি আমার চাপরাসীর নামে ?

—আমি আবার এতে কি লাভ পাব ?

—আমার কথা শোন। এখন যাও। বেলা একটার মধ্যে চেক্ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে সেটা তোমার জানা আছে ত ? বিকালে সাতটার পর দেখা করো, তোমায় একটা আঁক কষবার সহজ রাস্তা শিখিয়ে দিব।

বেলা বারটায় মধ্যে ইব্রাহিম সাহেবকে চেক্ দিয়ে, চিঠি সই করিয়ে আনলাম।

বিকালে পাঁচটার সময় বেড়াতে বার হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ইব্রাহিম সাহেবের পূর্বোক্ত খানসামা সেলাম জানিয়ে একখানি চিঠি—আমার হাতে দিল। পত্রখানি ইংরাজিতে লিখিত—

প্রিয় বন্ধু,

আপনি আজ যে অল্প সময়ের মধ্যে ও যেরূপ সুষ্ঠুভাবে আমার কাজ সমাধা ও মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ উপকার চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে।

শুনিয়াছি আপনি একা থাকেন; আপনার পাশে বিবি সাহেবা নাই। এক রাত্রির বাইজীর মজরোর খরচ সামান্য কটা টাকা পাঠাইলাম, গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।

দালালি	৫০৲ টাকা	আপনার—
যাচাই ফি	৮৲ "	ইঃ আঃ
	৫৮৲ টাকা	

রাত্রে কৃপারাম শেঠের গদিতে পৌঁছে সেদিনকার সকল খবর তাঁহাকে জানালাম।

কৃপা। আমি সমস্ত শুনে ভারি সন্তুষ্ট হলাম, রায়। ইব্রাহিম সাহেব দেখছি একজন খাঁটি কাজের লোক; কাহাকেও তার ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করেন না। এইটি আমি মানুষের একটি মহৎ গুণ বলে মনে করি। ব্যাগারে কাজ করালে কোন পক্ষেরই সুবিধা হয় না, না হয় যে করায়, না হয় যে করে, তার; তা ছাড়া কাজটাও প্রায় সুচারুরূপে সমাধা হয় না।

আচ্ছা এখন লেকচার বন্ধ থাক। এস তোমায় সেই অঙ্ক কষার সহজ প্যাঁচটা শিখিয়ে দিই। কাগজ পেনসিল নিয়ে বস।

এনেছ, আচ্ছা এখন ফেল—

(১ম) কৃপারাম শেঠ তার সিন্ধী ব্যাঙ্কারদের নিকট হতে শতকরা দু' টাকা সুদে টাকা পান।—উত্তর হাঁ পান।

(২য়) কৃপারাম নিজের গদিতে বসে ও কোনরূপ পরিশ্রম না করে চন্দ্রবাবুকে যদি শতকরা ৩½ সাড়ে তিন টাকা সুদে টাকা ধার দেন তাতে কৃপারামের কোন অভিযোগ করবার কারণ থাকতে পারে কি?—"উত্তর বোধ হয় পারে না"

(৩য়) অভাবগ্রস্ত চন্দ্রবাবু আজ নিজের সততার ছাপ নিয়ে শারীরিক পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে একজন ধনী ব্যক্তিকে বাজার চলতি শতকরা ১২ বার টাকা সুদে যদি টাকা ধার দেন তাহাতে চন্দ্রবাবুর কোন অন্যায় করা হয় কি?—"উত্তর অন্যায় করা হয় না"

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা এ ব্যাপারে ব্যবসার গণ্ডির মধ্যেই আছি, আমরা দুজনেই ব্যবসা করে থাকি অতএব আমরা কোন অন্যায় করি নাই।

এখন দেখ ১২ থেকে ৩½ বাদ দিলে বাকী থাকে ৮½, এই শতকরা সাড়ে আট টাকা চন্দ্রবাবুর ন্যায্য প্রাপ্য নয় কি? আবার দেখ যত দিন এই টাকা আদায় না হয় ততদিন চন্দ্রবাবু এ কাজের মুনফা মোটা-মুটি মাসিক ৩০।৩৫ ত্রিশ পৈঁত্রিশ টাকা পাবেন নিশ্চয়। প্যাঁচটা ভাল করে শিখে নাও চন্দ্রবাবু! সুবিধা পেলেই কাজে লাগাতে ভুলো না। ইহাতে আমাদের উভয়েরই লাভের সম্ভাবনা রয়েছে ত' কেমন?

বলিলাম আমি যে অভাবগ্রস্ত আপনি কেমন করে জানলেন শেঠজী?

তুমি না বললেও, নিতাই বশাকের জুয়াচুরির কথা ব্যানার্জী আমায় সমস্ত বলেছেন।

আমি শুধু কৃতজ্ঞতা মুগ্ধ হৃদয়ে শেঠজীর আধ আধ হাসি মুখের প্রতি চেয়ে রইলাম। কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ পর চন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন ওহে বসন্ত আজ পর্যন্ত আমার গুরু কৃপারামের সেই গণিতের প্যাঁচটা অক্ষরে অক্ষরে কষে আসছি। অর্থাৎ কাজে লাগিয়ে কিছু রোজগার করতে পেরেছি। অতএব তোমায় স্বীকার করতেই হবে আমি মাষ্টার মশাইয়ের একজন ফাষ্টো বয়।

এরপর আরও দু জন এইরূপ ধনী মাহাজন জোগাড় করতে পেরেছিলাম, বসন্ত।

২২

বলতে ভুলে গিয়েছি, বসন্ত, আমার অসুখের পরদিন হতেই রামলাল তার বিছানা পত্র এনে আমার বাসাভুক্ত হয়ে গেল। দেখলাম সকালে ভাঁড়ার বার করবার সময় নিজের খাবার মত চাল দাল রাঁধুনি চৌবে ঠাকুরকে ইচ্ছামত বার করে দিলে এবং ক্রমে ক্রমে বাসার সকল কর্তৃত্বভার হস্তগত করে বসলো। আশ্চর্য্য! এ সবের জন্য সে একবারও আমার হুকুম বা সম্মতির অপেক্ষা করলে না।

প্রথম দিনেই কিছু নগদি রোজগার হওয়ায় মনটা প্রফুল্ল ছিল। রাত্রে বাসায় ফিরে রামলালকে বললাম—রামলাল আজ কিছু উপরি আমদানি হয়েছে। বাসার জন্য যদি কিছু জিনিসপত্র দরকার থাকে তাহা এই টাকায় কিনে আনাও।

রামলাল সোজা হাত পেতে, নোট কখানা নিয়ে বললে—প্রথমেই আপনার জন্য কিছু বিছানা তৈয়ার করাতে হবে।

বললাম আমার কি বিছানা নেই?

—না, আপনার যুগ্যি বিছানা ত নেই। এরকম বিছানায় কি আপনার শোওয়া অভ্যেস ছিল বাবু? খাওয়া শোওয়ায় কষ্ট করলে শরীর টিক্‌বে কি করে?

কিছুদিন আগেকার কথা চকিতের ন্যায় আমার মনে পড়ে গেল। বললাম—আমার গা ছুঁয়ে বলত রামলাল আজ যা তোমায় জিজ্ঞাসা করব তার সত্য জবাব তুমি দেবে, কোন কথা গোপন করবে না?

—গা ছুঁই আর না ছুঁই আপনার সামনে মিথ্যে বলতে পারব না, কিছু গোপন করতেও পারব না বাবু। সে ক্ষ্যামতা ত আমার আর আপনি রাখেন নি বাবু।

—আচ্ছা আমার অসুখের সময় তুমি মা দুর্গাকে জানিয়ে ছিলে "হে মা দুর্গা আমার বাবুকে বাঁচিয়ে দে মা" একটা বড় ঘরকে, একটা পুণ্যের সংসারকে নষ্ট হতে দিস্ না মা।" মাঝে মাঝে আরও এই ভাবের কথা তোমার মুখ থেকে বেরুতে শুনেছি। আজ আবার বলছ —"আমার যোগ্য বিছানা নেই, খাওয়া শোওয়ার কষ্ট করলে সুখী শরীর বাঁচবে কি করে।" তুমি তবে আমার পূর্ব পরিচয় কিছু জানতে না কি?

প্রায় পাঁচ মিনিট মাথা নিচু ও চুপ করে থেকে, বোধ হয় কথা-গুছিয়ে বলবার জন্য ভেবে নিলে পরে আমার মুখের দিকে সোজা চেয়ে রামলাল বলতে আরম্ভ করল।

জানতাম না হুজুর, কিন্তু সেদিন, জ্বরের সময় বাতিকের ঘোরে আপনার নিজ মুখেই, আপনার পরিচয় জানতে পেরেছি। এর আগেও আপনাকে অনেকবার দেখেছি কি না।

জ্বরের ঘোরে আমি এমন কি কথা বলেছিলাম যাতে তুমি আমার পরিচয় বুঝে নিলে? আমাকে এর পূর্বে কবে কোথায় তুমি দেখেছিলে?

সে দিন জ্বরের ঘোরে আপনাকে অনেকবার পষ্ট করে বলতে শুনেছি—"প্রাণকৃষ্ট রায় সাবধান! বৈকুণ্ঠ রায়ের জমিদারি তুমি কিছুতেই রাখতে পারবে না। চন্দ্ররায়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে। রামচন্দ্রপুরে বৈকুণ্ঠ রায়ের বংশই প্রধান থাকবে"।

—আমি আর কিছু বলেছিলাম সেদিন ?

অনেক কথাই বলেছিলেন তার সমস্ত মনে আসছে না বাবু। তবে আর একটি কথাও আপনাকে সে সময় অনেকবার বলতে শুনেছিলাম, সেটি বেশ মনে আছে। কেবল বলতে লাগলেন—"আমি আর আমার মা। আমার মা আর আমি। কে তুমি ঐ সুন্দর ছোট্টমুখখানি নিয়ে বড় বড় ডব ডবে চোখের পাশে কাল কোঁকড়া চুলের ঝাপটা দুলিয়ে এসে আমাদের মাঝখানে বার বার আড়াল করে দাঁড়াচ্ছ ? কে তুমি তোমায় চিনতে পারছি না। তোমায় এখন চিনবনা—না—চিনব না—না—না !

রামলালের কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—এ থেকে আমার পরিচয়টা কি পেলে ?

প্রথম কথাটা থেকেই আপনার পরিচয় কতকটা বুঝতে পেরে ছিলাম, কিন্তু শেষ কথাটার কোন মানে বুঝতে পারিনি।

বাবু আপনাদের ইষ্টেটের উকিল শশি বাঁড়ুয্যে মশাইএর মুহুরী অবিনাশ মাঝির ছেলে আমি। আমার বাবার সঙ্গে অনেকবার আপনাদের দেশের বাড়ীতে গিয়েছি। পূজোর সময় গিয়ে সেখানে দুচার দিন থেকেও এসেছি। তখন খোকাবাবুকে ভাল করেই দেখেছিলাম কি না ?

—আমি যে সেই খোকাবাবু তার প্রমাণ কি, রামলাল ?

জ্বরের সময় আপনার কথা শুনেও সন্দো ছিল, বাবু, কিন্তু আপনি যখন পাশ ফিরে শুলেন, আমি খুব কাছেই বসেছিলুম কিনা—দেখলুম আপনায় চুলের ঐ চক্করটি আর ঐ ঘাড়ের ডান দিকের লাল জড়ুল। তখন আর কোনো সন্দো রইল না।

সেদিন আর কথা বাড়াতে সাহস হল না, কেবলমাত্র রামলালকে

সাবধান করে দিলাম—"রামলাল সাবধান! এখন কিছুদিন আমায় চিনেও চিনো না। যদি সময় পাই আমিই তোমার খোকাবাবুকে তোমায় ভাল করে একদিন চিনিয়ে দেব।

—বেশ বুঝতে পেরেছি হুজুর। আমার অবস্থা শুনলে আপনি নিশ্চয় আমার বিশ্বেস করতে পারবেন। এক কথায় এই মাত্র বলতে সাহস পাচ্ছি যে এ অধীনেরও অজ্ঞাত বাসের সময় এখনও শেষ হয়নি, কে জানে কোনোদিন তা হবে কিনা। আমার দুঃখের কথা আপনাকে নিবেদন করে মনটা একদিন হালকা করব এই আশা করে রয়েছি।

২৩

সেদিন রবিবার রায় সাহেবের আপিস ছিল না। বিকাল বেলা সদরের বারান্দাতেই চায়ের ব্যাপার আড়ম্বরের সহিত চলিতেছিল। অতিশয় শৌখিন ও সুন্দর চেহারা সাদা প্যাণ্টের উপর কাল আলপাকার আচ্‌কান, মাথায় ব্যাঙ্গালোর ক্যাপ, এক ভদ্রলোক আসিয়া হাসি হাসি মুখে অতি সম্ভ্রমের সহিত চন্দ্রবাবুকে সেলাম ও করমর্দন করিয়া, বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার মেজাজ ভালত রায় সাহেব? বিবি সাহেব, পোলাপান সব ভাল আছেন ত?

রায়। ভগবান সব ভালই রেখেছেন খাঁ সাহেব, আপনার খবর আশা করি সব ভাল।

খাঁ। খোদার দোয়ায় সব ভালই। আপনি চায়ের একজন ভাল টেষ্টার আর ভাল জিনিসই ব্যবহার করে থাকেন। তাই কিছু ভালো চা আপনার জন্ম এনেছি।

এই বলিয়া একটি প্যাকেট টেবিলের উপর রাখিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"আমার দুলে মিয়া অর্থাৎ জামাইবাবাজি জলপাইগুড়ীর

একটি বড় চা বাগিচায় ডাক্তারি কাজে আছেন। তিনিই এ চা পাঠিয়েছেন।”

রায়। বহুত ধন্যবাদ, তা এর জন্যে এত কষ্ট করে নিজে এলেন কেন? কোন লোকের দ্বারা পাঠাইলেই পারতেন।

খাঁ। অন্যকে সে রকমে পাঠান যায় কিন্তু আপনাকে নয়। কি যে বলেন? আপনি আমার কতখানি উপকার করেছেন, সেটা কি এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারি, রায় সাহেব? সেদিন আপনি আমায় রক্ষা করতে না দাঁড়ালে আজ ত আমাকে পথের কুত্তার মত দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হত সেটাত ভুলতে পারা যায় না সাহেব।

আর আমার নিজের আসার কথা যা বলছেন তার উত্তরে বলি নিজের হাতে প্রিয়জনকে কিছু নজর দিলে যেমন দিল খোস হয়, অপরের দ্বারা পাঠানোতে কি সেরূপ হয়? আমাদের পুরাতন কবি হাফেজ সাহেব তাঁর প্রিয়াকে উদ্দেশ করে লিখে ছিলেন—

“হে পিয়ারী সিরাজের সৌন্দর্য গৌরব।
হাফেজে ফিরায়ে দাও হৃদয় তাহার।
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি—
বোখারা সমরখন্দ দেবে সে তোমায়।

এই না দেখে হাফেজ সাহেবের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বাদসা দরবারে রিপোর্ট দিলেন যে—হাফেজ এমন বেতমীজ লোক যে সে তার পেয়ারীর গালের উপরের কালো তিলটির জন্য, সাহান-শাহের স্থাপিত. জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মূল্যবান নগরী দুটি—সমরখন্দ ও বোখারা তাঁর সেই প্রিয়তমাকে উপহার দিতে প্রস্তুত। ইহাতে তার অতি বড় ধৃষ্টতা যে প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিচার আবশ্যক।

বাদশার হুকুমে হাফেজকে বন্দী করে দরবারে হাজির করা হল।

খালিফ সুধালেন—"কবি তুমি এমন অন্যায় কথা কেন লিখেছ যাতে তোমার কঠিন সাজা হওয়া উচিত।"

কবি তখন করজোড়—এই সময় খাঁ সাহেব ও হাফেজের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া—আরজ করিলেন "ধর্ম অবতার! আমি বেশ ভাল রকম জানি যে, আপনি সারা দুনিয়া জয় করে ঐ সমস্ত দেশের সর্বোৎকৃষ্ট দৌলতাদি সংগ্রহ করিয়া আপনার রাজধানী সমরখন্দ ও বোখারাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় শোভা সম্পদে সাজাইয়াছেন এই জনপদের মূল্য বোধ হয় অঙ্কের দ্বারা সঠিক পরিমাণ করা যায় না।

এই নগন্য কবি তাই, আপনার নির্মিত এই নগরীদ্বয়ের মর্য্যাদা এবং ইহাদের নির্মাতা স্বয়ং সাহান-শাহের সুমহান কীর্তি ঘোষণার মানসেই এইরূপ উল্লেখ করিয়াছে। কারণ ইহাদের অপেক্ষা মূল্যবান উম্‌দা চিজ্‌ কবি কল্পনায় আসে নাই।

আর এক কথা আমার এই ধৃষ্টতার জন্যই ত এই নগন্য কবির চির বাঞ্ছিত তখতে-তাউসের মালিক খোদার প্রেরিত খালিফের দর্শন সৌভাগ্য হইল।

তাই বলি চা পাঠাবার আবশ্যক হওয়াতেই ত আপনার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল। কি বলেন রায় সাহেব?

চন্দ্রবাবু। খাঁ সাহেব আপনি কবি মানুষ, আর আমি একজন কুলী আদমী—চিরকালটা মাটি কেটে বেড়ালাম। কথায় আপনাকে পেরে উঠব না। হাফিজ কবি কি সাজা পেয়েছিলেন তাত জানালেন না, আপনাকে কিন্তু রীতিমত শাস্তি না দিয়ে ছাড়া হবে না। এই বলিয়া চন্দ্রবাবু, খাঁ সাহেবের আনিত প্যাকেট হইতে চা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। সমারোহে আর একবার চা পর্ব আরম্ভ হইল।

খাঁ সাহেব নিজের স্থানে পুনরায় বসিয়া সখেদে বলিলেন—কবি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন কিন্তু পুরস্কার জীবিত অবস্থায় তাঁহার নিকট

পৌঁছায় নাই। রাজ কর্মচারীরা উপহার লইয়া গিয়া দেখিলেন কবির শবদেহ সমাধিক্ষেত্রে পাঠান হইতেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক মজলিসের পর খাঁ সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২৪

আমি চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম দাদা লোকটির ত খাসা চেহারা বাঙলাও বললেন অতি সুন্দর, ইনি কি বাঙালী?

—হাঁ, এঁরা পূর্ব-বাংলা ময়মনসিংএর এক বনিয়াদি মুসলমান পরিবার ভুক্ত। ইনি আমাদের এড্‌ভোকেট্ জাফর খাঁ সাহেবের ভাইপো, নাম আবদার রহমান খাঁ। আমি বন্ধুভাবে রহমান সাহেব বলে থাকি।

—ইনিও ল' ইয়ার—আইন ব্যবসায়ী নিশ্চয়। বক্তাও মন্দ নন।

—না ওঁর চাচা সাহেবের ইচ্ছা ছিল ওঁকে ওকালতিতে দেন কিন্তু রহমান সেদিকে গেলেন না। এই নিয়ে জাফর সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়ায় রহমন সাহেব ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ করে এখন বেশ উন্নতি করেছেন। এখন বোধ হয় জাফর সাহেবের চেয়ে এঁর আর্থিক অবস্থা ভাল।

—এঁর কিসের কাজ দাদা? আপনাকে যথেষ্ট খাতির করেন দেখছি।

—আর ভাই, আমি ওঁর বিশেষ কিছু করতে পারি নি; বরঞ্চ ওঁর কাজে আমিও কিছু লাভ করতে পেরেছিলাম। সে একটা বেশ মজার ব্যাপার, তা থেকে কিছু শেখবার আছে বলে মনে হয়। এইবার বোধ হয় সেটা শোনবার জন্যে ফরমাস করবে?

যদি এতে শেখবার মত কিছু থাকে, আর তা বলবার যদি

কোন বাধা না থাকে আপনার, তবে শোনবার লোভ আমার হবেই ত।

—দেখ বসন্ত, আমাদের বাংলাদেশের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবাদ চলিত আছে "সব দিও, কাকেও আক্কেল না দিও।" আমার মত কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। কিছু না দাও কিন্তু সৎপাত্রে আক্কেল দান করলে শুধু সেই ব্যক্তির নয় তাতে দেশের ও দশের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটা গল্প বলছি শোন, বাদশাহী আমলে আগরা শহরে একজন হিন্দু, মারবেল পাথর জোড়বার একটা উৎকৃষ্ট মসলা তৈয়ার করতে জানতেন। ঐ মসলা নবাব সরকারে ও সাধারণের মধ্যে বিক্রি করে তিনি প্রভুত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ সময় যখন নিকট হয়ে এল, তখন অনেকে এমন কি রাজসরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ এল—"তোমাকে আরও অনেক টাকা দেওয়া যাবে তুমি ঐ মসলা প্রস্তুতের বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে যাও। কিন্তু সে তার এই আক্কেল আর কাহাকে,—যে প্রাণ তার শেষ হয়ে এসেছে, সেই প্রাণ ধরে, শিখিয়ে দিয়ে গেল না। কিন্তু পাছে রাজসরকার থেকে কোন চাপ আসে, সেই ভয়ে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করলে।

এমন একটা দরকারী শিল্প নষ্ট হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত সেরূপ সিমেণ্ট তৈয়ার হয় নাই কারণ তার মত মজবুত কাজ আর কেউ করতে পারছে না। প্রাণ দিলে তবু দিলে না আক্কেল, যাতে একটা বিশিষ্ট শিল্পের প্রচুর উন্নতি হতে পারত।

সেদিনকার মত উঠিবার সময় চন্দ্রবাবু বলিলেন—আমার গুরু আমার অযাচিত ভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন অতএব আমার নিকট কেহ কোন কথা জানতে চাইলে আমার সাধ্যানুসারে তার সঠিক উত্তর দিতে আমি ন্যায়তঃ বাধ্য। কি বল, নয় কি?

২৫

সেদিন সন্ধ্যায় চায়ের বাটীতে এক চুমুক দিয়েই চন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—আঃ—দেখেছ বসন্ত, কাল রহমন যে চাটা দিয়ে গিয়েছেন, জিনিসটা খুব উঁচু দরের। হবে না কেন চা বাগিচার ম্যানেজার ও ডাক্তার সাহেবরা প্রথমেই সব চেয়ে ভাল মালটুকু নিজেদের জন্য সংগ্রহ করে রাখেন। হাঁ তুমি রহমান সাহেবের কথাটা শুনতে চেয়েছিলে না ?

প্রায় আজ বার বৎসর আগের কথা প্রথম ব্যবসা করতে গিয়ে এই রহমন সাহেব কিছু স্কুল শ্লেট আমদানি করবার ইণ্ডেণ্ট দিয়েছিলেন। মাল এসে পৌছুলে নগদ দাম দিয়ে মাল উঠাবার মত টাকা ওঁর হাতে ছিল না।

উনি আশা করেছিলেন মাল এলে ওঁর চাচা জাফর সাহেব ওঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু চাচা সাহেব যখন শুনলেন যে রহমান লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ছোটখাট ব্যবসাতে লেগে গিয়েছে আর তার জন্য টাকা চায়, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাহায্য ত করলেনই না বরং এরূপ গালিগালাজ করতে লাগলেন যে রহমন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক মেসের বাসায় উঠতে বাধ্য হল।

এই রহমন খাঁ, রসিদ কাজী, পান্না মিত্তির প্রভৃতি আমরা কয়েকজন সমবয়সী বন্ধু সন্ধ্যার সময়, নদীর উপর জেটীতে বসে গল্প গুজব করতাম। পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠে ছিল, এই নির্বান্ধব দেশে ! তখন বাঙালীর সংখ্যা খুব কম ছিল কিনা।

আমাদের আপিসওয়ালারা বর্মা রেলওয়ে কোম্পানিতে সরবরাহ করবার জন্য দু' তিন রকম মাল—প্যাকিং কাগজ, ষ্ট্রবোর্ড ইত্যাদি—বেশ

অধিক পরিমাণে, বাৎসরিক প্রায় দু'লাখ টাকা মূল্যের, আমাদানি করাতেন। ষ্টীল্ ব্রাদাস্ কোং এই সকল মালের এজেণ্ট ছিলেন! জান বোধ হয় এই ষ্টীল এখানকার প্রথম শ্রেণীর বনিকদের মধ্যে অন্যতম।

আপিসের এই কাজের জন্য ষ্টীলের আমদানি বিভাগে, ইম্পোর্ট ডিপার্টমেণ্টে আমার অনেক সময় যাতায়াত করতে হ'ত আর ঐ বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী মার্টিন সাহেব আমায় একটু সুনজরে দেখতেন। আমি সাহেবকে বাজারের অবস্থা ও ব্যাপারীদের অনেকের খবর জানাতাম। আমার দেওয়া ঐ সকল খবর অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হতো বলে মার্টিন আমায় বিশ্বাসও করতেন।

রহমন সাহেব ষ্টীলের আপিসেই শ্লেটের ইণ্ডেণ্ট দিয়েছিল। মাল পৌছলে, নগদ টাকা দিয়ে, মাল খালাস করতে পারলে না কিন্তু।

ষ্টিল ব্রাদাস্ তাকে উকিলের চিঠি দিলেন যে,—"তোমার ইণ্ডেণ্টের মাল এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিয়া খালাস করতে না পারলে, আমরা মালের উপর গুদাম ভাড়া চার্য করব। এবং তোমার দায়িত্বে মাল খোলা বাজারে বিক্রয় করব। তাহাতে যদি লোকসান হয় তাহার জন্য তোমাকে দায়ী হতে হবে" ইত্যাদি।

ঐ দিন রাত্রে জেটীতে একটু নিরালায় আড়াল হয়ে বসে রহমন আমায় তার এই দুরবস্থা ও অসুবিধার কথা সবিস্তারে জানালে।

তোমায় বলেছি সে সময় আমার টাকা রোজগার ছাড়া অন্য চিন্তা কিছু ছিল না, অতএব ভাবতে লাগলাম, এই ব্যাপারটা থেকে কিছু লাভের পন্থা বার করা যায় কিনা? রহমনকে বললাম হয় ত আমি আপনার এই কাজের কিছু সুবিধা করে দিতে পারি। আমায় দুদিন সময় দিন চেষ্টা করে দেখবার জন্য।

২৬

পরের দিন সন্ধান করে জানলাম বাজারে স্কুল শ্লেটের চাহিদা খুব জোর। কিন্তু মাল কাহারও ঘরে নাই। এ মালের প্রধান ব্যাপারী আতাউল্লা মিয়ায় মাল যথা সময়ে জাহাজে উঠে নাই। অর্থাৎ যাকে বাজার চলিত কথায় বলে "সাট্ আউট্" হয়ে গিয়াছে। পরের জাহাজে মাল রেঙ্গুনে পৌছতে আরও পঁয়তাল্লিশ দিন অর্থাৎ দেড় মাসের বেশী সময় লাগিবে।

এই শ্লেটের প্রধান খরিদ্দায় সুদূর মফস্বলের চিনা ব্যাপারীরা মালের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং দোকানে দোকানে ঘোরাঘুরি করছে। বর্ষার পর ছোট ছোট নদী ও খাড়িগুলির জল শুকিয়ে গেলে কোন মাল ঐ সকল স্থানে চালান দেওয়া যায় না।

এই অবস্থায় বাজারে মাল আনতে পারলে বিক্রি হতে কিছুমাত্র দেরি হবে না, আর ভাল দামও পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

রহমন দুদিন পর খবর নিতে এলে তাকে স্পষ্ট করে বললাম—দেখুন মিয়া সাহেব আপনার তবুও ভাই ও চাচা সাহেব আছেন, নিতান্ত অভাব হলে একদিন আপনি তাঁহাদের সাহায্য পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু দেখেছেন আমি এ বিদেশে একক ও নিঃসহায়, কেবলমাত্র অর্থাভাবে এদেশে এসে পড়ে আছি।

আমি যদি মালটা খালাস করে দিতে পারি তবে আমার কি লাভ দেবেন বলুন? রহমন উৎসাহিত হয়ে তখনই বলে উঠলো—এতে যা লাভ হয় সমস্তই আপনি নিন, কেবল বাজারে যাতে আমার বদনাম না হয় সেইটে বাঁচিয়ে দিন।

—আমি ততটা লোভী নই ভাই, আসুন লাভের অংশ আধাআধি অর্থাৎ অর্দ্ধেক আপনার অর্দ্ধেক আমার। কেমন?

—বেশ কথা। এটা আপনার নিতান্ত দয়া বলেই, আমি মনে রাখব, রায় মশাই। আপনি পুরাপুরি চাইলেও আমি আহ্লাদের সহিত রাজী হতাম।

২৭

ঠিক লাঞ্চের পর ষ্টীল ব্রাদার্সের আপিসে মার্টিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম।—গুড্ আফ্‌টার নুন্ স্যার—

—হ্যালো রায় কি খবর?

বললাম কিছু স্কুল শ্লেটের অর্ডার পেয়েছি সাহেব, আনিয়ে দিতে পারেন? জাপানি মাল চলবে না, আর এক মাসের মধ্যে সিপ্‌মেণ্ট জাহাজে রওনা করা চাই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখ লক্ষ্য করে মার্টিন বলল—মিঃ রায়, আমি সম্ভবতঃ আমাদের গুদাম থেকেই কিছু সরেস মাল তোমায় দিতে পারি।

আমি। রহমন খাঁর মাল থেকে না কি?

জানি ব্যবসার নীতি হিসাবে এ ক্ষেত্রে এ কথা প্রকাশ করা আমার উচিত ছিল না বটে, কিন্তু কেবলমাত্র এই মালটা ধোঁকা দিয়ে বার করে আনবার উদ্দেশ্য ত আমার ছিল না, এই সূত্রে ষ্টীলের আপিসে একটি স্থায়ী ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন করাই আমার সেদিনকার মতলব ছিল।

রহমনের জন্যই যে আমি নিয়েছি একথা সম্ভবতঃ মার্টিনের নিকট গোপন থাকবে না। সেই জন্য সাহেবকে সকল কথা প্রকাশ করে বলাই আমি সংগত মনে করেছিলাম। সরল সোজা পথে গিয়ে মানুষ যদি গর্তে পড়ে তাতে তার মনে ব্যর্থতার ক্ষোভ থাকে না। আমার বিশ্বাস সরলতাই শীঘ্র আমাদিগকে সফলতার মন্দিরে পৌছে দিতে পারে।

মার্টিন। তুমি তার কথা জান না কি? হাঁ সে মাল খালাস করতে

পারে নাই, আর সহজে যে পারবে তাও বোধ হয় না। সে যদি আমাদের একটা নাদাবি লিখে দেয়, তা হলে আমি এখনই তোমায় তার মাল ছেড়ে দিতে পারি।

অনেক দর কষাকষির পর ঠিক হল—

(১) আমি রহমন খাঁর নিকট হতে একটা নাদাবি লিখিয়ে দিব।

(২) সপ্তাহে অন্ততঃ একশ বাক্স মাল, বেশী হলে ক্ষতি নাই, আমায় ডেলিভারি নিতে হবে।

(৩) প্রতি লটের টাকা ডেলিভারির তারিখ হইতে নব্বুই দিনের মধ্যে চুকিয়ে দিতে হবে।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। প্রথম একশ বাক্স প্লেট দুদিনের মধ্যেই রমহন খাঁর দোকানে পৌঁছে বিক্রয় আরম্ভ হয়ে গেল। বাজারে রহমনের মান রক্ষা হয়ে গেল।

দশ টাকা হিসাবে বাক্স কেনা মাল সহজেই টানের মুখে পনর টাকায় বিক্রয় হতে লাগল। দু' মাসের মধ্যে মোট ছ' হাজার টাকা লাভের অর্দ্ধেক তিন হাজার টাকা আমি পেয়ে গেলাম। রমহন খাতির করে আমায় একটি তিনশ টাকা দামের হীরের আংটী উপহার দিয়াছিল।

২৮

বসন্ত, শুনলে তুমি এখন হয়ত হাসবে যে, আমি মাস দুই পরে ঐ আদরের উপহার আংটীটি একজন বার্মিজ ভদ্র লোককে চার শত টাকার বেচে দিয়েছিলাম।

—আচ্ছা লোক ত দাদা আপনি, উপহারের আংটীটা বেচে দিলেন।

—কারণ তখন আংটী পরবার মত অবস্থা আমার ছিল না হে। তারপর ইকনমিক্স্ বলছে ঐ ছোট জিনিসটির রক্ষনাবেক্ষণ করতে

আমায় সর্বদা বিব্রত হয়ে থাকতে হতো, আর ঐ একটুকরো কাঁচের মধ্যে চারশ টাকা আটক রাখলে মাত্র চারশই থেকে যেত কিন্তু এ. পি. সুরন্ন‌নিয়ম চেঠির ঘরে ঐ চারশ,' তিন বছরে সুদে আসলে কম করে পাঁচশতে দাঁড়িয়েছিল।

—আচ্ছা ইকনমিক্স্ আপনাকে পেয়ে বসেছিল।

—"ছিল" কিহে, জানো এখনও আমি একজন ইকনমিক্সের একনিষ্ঠ পূজারী, ভুলে যেও না বসন্ত, তুমি আমার ইকনমিকসের ছাত্র, আর তাই লেখবার জন্য আমার এই অর্বাচিন কথাগুলি শুনে শুনে নোট করছ; এ কথাত একাধিকবার তোমায় বলতে শুনে আসছি।

—শোন বসন্ত। ঐ শ্লেটের কাজ আমরা যৌথরূপে প্রায় ছয় সাত বছর চালিয়েছিলাম, পরে অনেকেই যখন ঐ কাজ আরম্ভ করলে, লাভের অংশ ক্রমে কমে আসতে লাগল তখন বন্ধ করে দিয়াছিলাম।

ঐ সময় আমাদের মধ্যে একটি তামার পয়সা নিয়ে পর্যন্ত কখন কোন গোল হয়নি। রহমন সাহেব লোকটি সত্যই খাঁটি ও সদাশয় লোক। প্রকৃতই উনি আমায় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে দেখা করতে আসেন। কাজ কর্মের এখন বেশ উন্নতি করেছেন। অবস্থার পরিবর্তনে পূর্বকথা ভুলে যান নাই।

—আমি বলিলাম তাই ত দেখলাম দাদা। অতঃপর?

চন্দ্রবাবু বলিলেন—তারপর আবার কি বসন্ত। এরপর ঠিক এইরূপ টাকা, আনা, পাই, কেনা বেচা লাভ লোকসান, সুদ আসল যা নিয়ে চিরকালটা কাটিয়ে এলাম। তোমরা হলে ছোকরা লোক এই শুখনো কথা কি তোমাদের ভাল লাগবে হে?

—দাদা আপনি ভুলে যাচ্ছেন যদি লিখতে পারি, আমার এই বইয়ের নাম দেবো ঠিক করেছি "জীবন্ত ইকনকিস্" তাতে এই টাকা আনা পাইএর কথাই ত থাকবে। তা ছাড়া আপনি যার মধ্যে কখনও প্রবেশ

করেন নি সেই লভ্ অ্যাফেয়ারের (প্রণয় প্রসঙ্গের) বিষয় কি করে জানতে চাইব, আপনার কাছে বলুন ?

কপট উত্তেজনার সহিত চন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—কি বললে বসন্ত, আমার জীবনে প্রণয় প্রসঙ্গ কিছুই নাই। হাঁহে আমি কি চিরকালটা এইরকম বুড়োমানুষটি ছিলাম। আচ্ছা তা হলে দেখছি জবর রকম রসাল আমার একটা প্রণয় কাহিনী তোমায় শুনিয়ে দিতে হয়।

তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে—ব্যবসাদারী, পাটওয়ারী প্যাঁচ শেখবার জন্য যদি কিছু শুনতে চাও, তবে রোজ একটা করে নূতন নূতন শুনিয়ে দিতে পারি। তোমাদের বয়সে, যৌবনে ব্যাঙ্ক্ব্যালানসের দিকেই আমার দৃষ্টি স্থির রাখতে হয়েছিল, তাই প্রণয়িনী সোহাগিনীদের নিয়ে বড় বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবার সময় পাই নি।

সেইজন্য যে দু' একটা ভেসে এসে গায়ে ঠেকবার উপক্রম করেছিল তাদের খুঁটিয়ে গুছিয়ে বর্ণনা করতে বোধহয় পেরে উঠবো না। আমি ত আর তোমাদের মত লেখক নই যে, অঘটনকে ঘটা করে ঘটিয়ে দিতে পারব। যতটুকু সত্যই ঘটেছিল তাই কোন রকমে ডাইরিতে লিখে রেখেছি। আমার গতি বিধির সীমা ত দোকান, বাজার, সওদাগরী আপিস, উকিল এটর্নিদের অফিস ও ষ্টক্ একচেঞ্জ পর্যন্ত।

কল্পনার ধ্যান লোকে ত কোনদিন হাওয়া বদলাতে যাই নি, ভাই।

—দাদা আমি শপথ করে বলতে পারি আপনি কোনদিন বুড়ো ছিলেন না—এখনও নয় এবং ভবিষ্যতে যে কোনদিন বুড়ো হবেন তাও আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব এবার একটা সরস মধুরেরই অবতারণা করে ফেলুন।

ব্যাড বয়। ওহে, ইচ্ছা করলেই কি রসের বান ডাকান যায়, সেটা দেশকাল পাত্র সাপেক্ষ। ঠিক সময় শুনিয়ে তোমায় তাক্ লাগিয়ে দেবো একদিন।

২৯

চন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায়।

তখনকার দিনে ভাইসরয়—ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে তাঁর কাজের নির্দ্ধারিত পাঁচ বৎসব মেয়াদের মধ্যে একবার ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করিতে আসিতে হইত। আজ তাঁর রেঙ্গুণে পৌছাবার কথা।

লাট সাহেবের সম্বর্দ্ধনার জন্য জাহাজঘাট জেটি ও শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি সুসজ্জিত করা হইয়াছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুষ্পপত্র ও পতাকা শোভিত তোরণগুলি এদেশের কারিগরদের শিল্প নৈপুণ্য ঘোষণা করিতেছে। দেখিলে মনে হইতেছে যেন আজ সমগ্র ব্রহ্ম রাজধানী এক নব সাজে সজ্জিত হইয়াছে।

অপিস, আদালত, স্কুল কলেজ ও কারখানা সমস্তই চারিদিনের জন্য বন্ধ। প্রাতে আমরা শহরে বেড়াইয়া ঐ সমস্ত দেখিয়া আসিলাম। মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর কোন কাজ না থাকায় আমি চন্দ্রবাবুকে বলিলাম —দাদা, কাল বড়লাট "সুয়েডেগন" অর্থাৎ বড় 'প্যাগোডা দেখতে যাবেন। পাস ভিন্ন ভিতরে ঢুকতে দেবে না, আর যদিও আপনি পাস জোগাড় করতে পারেন, তবুও অসম্ভব ভিড়ে কষ্ট পেতে হবে। আজও ওখানে সব সাজান হয়েছে, আজই দেখে আসা যাক চলুন না।

—মন্দ কথা নয় বসন্ত, গেলে ত হয়।

এই কথা শুনে, আমার ছাত্র মণি, চন্দ্রবাবুর পুত্র, ছুটিয়া আসিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল—কাকাবাবু, আমি যাব। আমি তাকে সেইরূপ নিম্নস্বরে

বলিলাম—হাঁ আমরা সবাই যাব, তুমি মাকে তৈরী হতে বলগে, আর তুমিও কাপড় বদলে নাওগে।

চন্দ্রবাবু সন্দিগ্ধভাবে, ঠোঁটের কোনে একটু স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরু শিষ্যে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে?

—ও কিছু নয়, তা হলে গাড়ি বার করতে বলে দিই?

—আচ্ছা দাও। আর বলে দাও এক কাপ্ করে ন্যাংটা চা আমাদের দিয়ে দিতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ন্যাংটা চা কি দাদা?

—তোমাদের ভাষায় বুঝি বলে "নেকেড টি" বা প্লেন টি, না? অর্থাৎ এক কাপ্ চা মাত্র, তার সঙ্গে কোন উপকরণ নয়।

গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল পূর্ব হইতেই মণিরা, মাতা পুত্র সামনের সিট দখল করিয়া বসিয়া আছেন। চন্দ্রবাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—বসন্ত এটি তোমারই কীর্তি।

প্যাগোডা দেখা হইয়া গেল। ফিরিবার সময় গাড়িতে উঠিতে উঠিতে মণির মা প্রস্তাব করিলেন—চল না একবার তোমার চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হয়ে যাওয়া যাক্। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, এদিকে ত আর সহজে আসা হয় না। যাবার রাস্তাতেই ত পড়বে।

চন্দ্রবাবু যাত্রার ধরণে সুর সংযোগে ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে গাহিয়া উঠিলেন—

"আমার বাঁয়ে রাধা ডাইনে চন্দ্রাবলী,
বল এখন কারে রাখি কারেই বা ফেলি।"

অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের গাড়ি একটি ছোট রকম অতি সুন্দর বাংলো বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল। আমরা সোজা সামনের হল ঘরে ঢুকিলাম। চন্দ্রবাবু টেবিলের উপরিস্থিত কলিংবেলে বার দুই

অঙ্গুলির আঘাত দিবা মাত্র একজন মাদ্রাজী বয় দেখা দিল ও চন্দ্রবাবুকে অতি সম্ভ্রমের সহিত সেলাম বাজাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে খবর জারী করিতে ছুটিল।

আমরা সকলে বসিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন ফিরিঙ্গী মেম-সাহেব হাসি হাসি মুখে ও চটুল পদে আসিয়া দেখা দিলেন। মহিলাটিকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামল। পাতলা ছিপছিপে চাপা গড়ন। তবে মুখ চোখের আকৃতি ও ভাব অনিন্দনীয় এবং বয়স আঠাস ত্রিশ বৎসর হইলেও একটি কমনীয় ভাব তাহার সমস্ত দেহে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

মণি ছুটিয়া গিয়া তাহার আন্টির গণ্ডে চুম্বন দিতেই তিনি তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—"হাউ লাকি, হাউ গ্ল্যাড অ্যাম,—কি সৌভাগ্য কত যে খুসী হলাম ইত্যাদি।"

পরে রায় গৃহিনীর কর মর্দনান্তর—সো আফ্‌টার অ্যান এজ, (ওঃ কতদিন পর) বলিতে বলিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিতরে লইয়া চলিলেন।

চন্দ্রবাবু কৃত্রিম হতাশ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমাদের বুঝি চিনতে পারলে না মেম সাহেব?

ঠোঁটে হাসি ও চোখে রাগ ফুটাইয়া মেম সাহেব বলিয়া গেলেন—হোল্ড অন সিলি বয়, উই শ্যাল বি ব্যাক্ ইন্ হাফ এ মিনিট। দেয়ার দি পিক্‌চার বুক্‌স্ ফর ইউ"—সবুর কর দুষ্টু ছোকরা, আমরা আধ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি, ওখানে ছবির বই তোমার জন্য রেখে গেলাম।

আমরা সত্যই টেবিলের উপর সুন্দর ভাবে রক্ষিত ছবির বইগুলি উলটাইতে লাগিলাম। আধ মিনিট ছাড়িয়া পাঁচ মিনিট হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বেহারা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল।

আরও দশ মিনিট পরে, মেঘলা কাটিলে শরতের আকাশে যেমন বিমল চন্দ্রোদয় হয়; সেইরূপ যুগল মেম সাহেব—হোস্টেস্ অ্যাণ্ড গেষ্ট্ (তিথি ও অতিথি) গলা ধরাধরি করিয়া উদয় হইলেন।

চন্দ্রবাবু। এতক্ষণে ঘরটা আলো হলো বলে মনে হচ্ছে।

মেম। "রিয়েলি"—সত্য নাকি?

মিঃ রায় মহা আড়ম্বরে মেম সাহেবের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন—দিস্ ইজ্ লীলি ম্যাম্, বেগ পারডন; মিসেস্ ডিসিলভা এ্যাণ্ড হিয়ার মিঃ সেন, বি, কে, সেন। আমাদের উভয় পক্ষ হইতে "ভেরি প্লিজ্‌ড" ও পরবর্তি ইত্যাদির কোন ত্রুটি হইল না।

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কর্তা কোথায়?

মেম। মৃদু হাসিয়া—আজ ছুটির দিন তাঁকে পাবেন কোথা? ভোরের সময় ব্যাগ ও বন্দুক নিয়ে সরে পড়েছেন। ফিরবেন সেই রাত্রি দশটায়।

দুঘণ্টাব্যাপী হাসি তামাসা ও আত্মীয়তার মধ্যে চা পান শেষ করিয়া রাত্রি ৯টার সময় আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

সে রাত্রে আমাদের বৈঠক বসিল না। আহারাদির পর শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই বিদেশী ফিরিঙ্গী পরিবারের সহিত চন্দ্রবাবুদের এত মাখামাখি, এত আত্মীয়তা কিসের?

৩০

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হইয়াছিল। ঘরের দরজা খুলিতেই প্রথম দেখিলাম চন্দ্রবাবু স্বয়ং বারান্দার রেলিংএ ঠেসান দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন ; খালি গা কাঁধে একখানি তোয়ালে ঝুলিতেছে মাত্র। আমার দরজা খোলার শব্দে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হে, আজ যে উঠতে এত দেরি করে ফেল্লে ? রোজই ত আমার আগে তোমার ঘুম ভাঙ্গে ?

—হাঁ আজ একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে ; কাল রাত্রে অনেক্ষণ পর্যন্ত আপনার মেম সাহেবের কথা ভাবছিলাম।

—সে কি হে গুরুজনদের নিয়ে এ রকম ভাবনা হওয়াত ভাল কথা নয়।

—এতে ভালমন্দের কথা কিছু আসছে না ত দাদা। তবে রহস্যটা ?

—রহস্য ? রহস্যটা ভেদ করতে চাও নাকি ? আচ্ছা বেশ, সেটা আমাদের তৃতীয় পাণ্ডব সব্যসাচী অর্জুন ঠাকুরের লক্ষ্য ভেদের মত কিছু শক্ত কাজ নয়। এটি হচ্ছে একটি পল্লী যুবকের প্রথম প্রণয় প্রসঙ্গ, অতি সহজেই আজ বিকালে সমাধান করে দেওয়া যাবে।

—প্রণয় প্রসঙ্গ, বলেন কি দাদা !

—তবে, তুমি কি মনে কর মেম সাহেবকে নিয়ে "বীরাঙ্গনা কাব্য" ? এখন বল দেখি কেমন দেখলে আমার চন্দ্রাবলীটিকে ?

—ঠিক ঠিক বর্ণনা করবার আমার সাধ্য নেই দাদা। যদি অনুমতি করেন তবে বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলি—

"দেখিলাম সরোবরে কাঁপিছে পবন ভরে
মৃণাল উপরে মৃণালিনী"। কিন্তু একটু কুয়াসাবৃত।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ মিষ্টিরিয়াস—কিছু রহস্যময়ী।

—বটে আগে ইতিহাসটা শোন, তারপর তোমার মতামত প্রকাশ করো।

৩১

চন্দ্রবাবুর প্রাত্যহিক সান্ধ্য বৈঠকের অনতিপূর্বে ঃ—

আমি অন্ততঃ আধঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছি শুনিলাম মিঃ রায় স্বগত কি বকিতে বকিতে উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ব্যাপার দাদাবাবু ?

—আরে তোমার দাদাবাবু মহাশয় এতক্ষণ ভীষণ হাঙ্গামার পড়েছিলেন। জানত আজ গিন্নীদের "নারী সমিতির" বাৎসরিক উৎসব, আরম্ভ হবে সাড়ে ছটার সময়, এখন থেকে উনি সাজ গোজ করছিলেন।

দশখানা সাড়ী দশ পনরটা জামা ক্রমান্বয়ে পরছেন ও ছেড়ে ছেড়ে জড়ো করে রাখছেন, কোনটাই ওঁর পছন্দ হচ্ছে না। এই দেখে অসাবধানতা বশতঃ আমি বলে ফেলেছিলাম—গিন্নী, তুমি ও ব্যবসাটা ছেড়ে দাও।

বললেন—কোন ব্যবসা ?

—এই সাজ গোজ করাটা আর কি।

—কেন ?

—আর বুড়ো হয়ে গেছ যে।

ডবডবে চোখে লালীমা ফুটিয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে বললেন—না গো মশাই না আমি বুড়োও হইনি কুচ্ছিতও হইনি।

—সেটা স্বীকায় করি, শুধু আমি কেন পাড়ার অনেক লোকই সেটা স্বীকার করে। চেহারাটা বেশ বাগিয়ে রেখেছ কিন্তু ; গরম জলে স্নান কর বুঝি ?

—আচ্ছা এখন যাও, সরে পড় দিকি, আমার মাথা খারাপ করে দিও না।

এই এতক্ষণে সাজঘরের পালা শেষ করে গিন্নী বেরুলেন। আর আমি নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তালা বন্ধ করে তবে আসছি। আমি বলিলাম নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার এখানে এল কি করে দাদা ?

তখন "নিমচাঁদের" অভিনয় ভঙ্গিতে ও ভাষায় হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"এটা আর বুঝতে পারলে না ভায়া।

রাবণ রাজার স্বর্ণলঙ্কার কেল্লার মধ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে রাক্ষসকুলের বীরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ ইন্দ্রজিতের সহিত রামানুজ, বীর-কেশরী সৌমিত্রি, লক্ষণের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ইন্দ্রজিত হত হন, এটা জানা আছে ত ?

যুদ্ধ সময়ে দুই বীরের পদাঘাতে যজ্ঞের নানাবিধ উপকরণ ও পূজার পাত্রাদি যেরূপ লণ্ডভণ্ড ও স্তূপাকার হয়ে গিয়েছিল, এক্ষেত্রে সেইরূপ সাড়ী সেমিজ, ব্লাউজ বডি জ্যাকেট সায়া পাউডার স্নো ক্রীম, ইত্যাদি লণ্ড ভণ্ড ও স্তূপাকার হয়ে আছে।

হয়ত খুঁজলে তার মধ্যে দুএক খানা সোনাদানাও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই দরজায় একটা মোটা রকম তালা বন্ধ করে দিতে হল।

—বৌদি ফিরবেন কখন ?

—সে কথাটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ওঁদের আজকার প্রোগ্রাম—কার্য্য তালিকার ১৭ ধারায় দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের "বিদায়—অভিশাপ" অভিনয় হবে। তোমার বৌদি কচের অংশ গ্রহণ করেছেন।

অতএব ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কচ মহাশয়া তাঁর বহু কষ্টার্জিত সঞ্জীবনী মন্ত্র স্বর্গের হাইকমাণ্ডদের না জানিয়ে কি আর ফিরতে পারবেন। আর স্বর্গ জায়গাটা যদি পছন্দমত হয়, ভাল লাগে, হয়ত সেখানে থেকেও যেতে পারেন কিছুদিন। মোট কথা তাঁর ফিরতে সেই শেষ রাত্রি।

প্রথম হতেই উক্তরূপ সরস আলাপ শুনে ভাবলাম দাদার মনটা আজ প্রফুল্ল দেখছি। এই সুযোগে দাদার প্রণয় কাহিনীটি শুনে নেওয়া যাক্।

বলিলাম—দাদা, আপনার চন্দ্রাবলীর রহস্যটা আজ সমাধান করার কথা আছে। বৌদির উপর রাগ করে সেটা ভুলে যাননি ত ?

তিনি দিপ্ত কণ্ঠে বললেন—রাগ! বল কি হে, রাগ ত নয়, ঠিক তার বিপরীত। অনেকদিন পরে তোমার বৌদির মাজা-ঘসা সাজ-গোজ করা চেহারাখানা দেখে প্রাণটা বরঞ্চ কিছু রসসিক্ত হয়ে পড়েছে।

৩২

শোন তবে দাদার বাঁদরামিটা, বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না এই বলিয়া চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁর রসিকতার ভাবটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। পরে বেশ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

বর্মা রেলওয়ের আপারগ্রেড্ ইঞ্জিন ড্রাইভার অর্থাৎ যাঁরা মেলট্রেন সমূহের ইঞ্জিন চালিয়ে থাকেন—মিঃ জর্জ ফিচ্‌লির একমাত্র সন্তান মিস্ ইলোনোর, সংক্ষেপে লীলি ফিচলির সহিত আমার প্রথম দেখা হয় আমাদের প্রেস ম্যানেজার বুড়ো ডি-সুজা সাহেবের বাড়ী একটি পার্টিতে।

আমি বাসায় একলা থাকতাম বলে, প্রায় প্রতি শনিবারে বুড়ি-ডিসুজা মেম আমাকে হয় চা পার্টিতে নয় ডিনারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। আমায় খুসি করবার জন্য তাঁদের কিছু স্বার্থও যে না ছিল, এমন নয়।

ভদ্রভাবে সংসার চালাবার মত যথাযথ মাসিক মাহিনা নির্ধারিত থাকা সত্বেও, বেহিসাবি খরচের জন্য সর্বদা তাঁরা অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়তেন। এই সময়ে তাঁদের আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হতে হোত। ফার্মের ক্যাশ আমার জিম্মায় ও পরিচালনায় থাকত, আমি নিজের দায়িত্বে ঐ সময়, টাকা পাওনা হবার পূর্বেই কিছু কিছু অগ্রিম দিয়া তাহাদের অসুবিধা দূর করে দিতাম।

ডিসুজা সাহেবের এক জামাই ছিল, তার নাম টম,-টমাস পদবীটা এখন মনে আসছে না। টম একাউণ্টে অর্থাৎ হিসাবের কাজে বেশ পাকা ছিল। কিন্তু তার মত মাতাল ও বদমায়েস প্রায় দেখা যেত না। সর্বদাই তার অভাব, সর্বদাই সে টাকার জন্য আমায় বিরক্ত করত।

ড্রাইভার ফিচলি মাণ্ডেলে সেক্সনে বদলি হয়ে গেলেন। মিসেস ফিচলির,—লীলির মার, শরীর ভাল ছিল না। তার চিকিৎসার জন্য তাঁকে রেঙ্গুণে রাখা আবশ্যক তাই কিছু দিনের জন্য লীলিরা, মা মেয়েতে, আমাদের ডিসুজা সাহেবের বাড়ী বোর্ডার হয়ে রয়ে গেল। শুনে ছিলাম তাহাদের মধ্যে একটা দূর আত্মীয় সম্পর্কও ছিল।

আমার যথা অযথা বহুগুণ ব্যাখ্যা করে টম সাহেব লীলির সহিত আমার পরিচয় করিয়ে দিয়াছিল ও তাকে ধরে এনে আমার পাশের চেয়ারে প্রায় বসিয়ে দিত। তখন বুঝতে পারি নাই যে, লীলির ফাঁদে জড়িয়ে সে আমাকে তার বশে আনতে ও সময়ে অসময়ে চাপ দিয়া আমার নিকট টাকা আদায় করবার মৎলবে আছে।

আমি তখন তেইশ আর মিসিবাবা লীলি অষ্টাদশী। মানুষের জীবনের বিশেষ একটা বয়সের সময় কোন বিশেষ বয়সের নারীকে দেখলেই তাকে আবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছা করবে। হাজার চেষ্টা করেও যেন চক্ষু ফেরাতে পারা যায় না। এ ক্ষেত্রেই বা তাহার ব্যতিক্রম হবে কেন?

প্রথম দেখতে ইচ্ছা, তারপর ভাবতে ইচ্ছা, একটু সহানুভূতি, একটু স্নেহ, একটু সান্নিধ্য দুই তিন মাসের মধ্যে আমাদের তিল তিল করে বেড়ে যেতে লাগল। যখন তখন সুযোগ পেলেই টম লীলিকে আমার দিকে ঠেলে দিত। ক্রমে দেখতাম লীলিও বেশ সহজেই আমার পাশে তার নিজের স্থান করে নিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমারও সেটা এমন কিছু অসংগত বলে মনে হতো না।

ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। ব্রহ্মদেশের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। বড়দিনের মরশুম ও বাজার বেশ জমে আসছে।

"ফিলিপিনো" সার্কাস কোম্পানি, অষ্ট্রেলিয়া ও চায়না ঘুরে এসে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে খেলা দেখাচ্ছে। "বেনম্যান" অপেরা কোম্পানি প্রতি রাত্রে জুবিলি হলে থিয়েটার চালাচ্ছে। সহর বেশ সরগরম।

অপেরা কোম্পানির, হ্যাণ্ড-বিল, পোষ্টার, টিকিট প্রভৃতি সমস্ত ছাপার কাজ আমাদের ছাপাখানাতেই হচ্ছিল সেই সময়। ওখানকার কর্মচারীদের সংগে আমাদের ঐ সুত্রে বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাঁরা আমাদের একখানি করে সিজন পাস দিয়েছিলেন।

সে দিন শনিবার, বিকালে চা পার্টিতে বসে লীলি মিসেস্ ডি-সুজা (বুড়ী-মেম) কে ধরে বলল—চল গ্র্যানী আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক।

গ্র্যানী ঠোঁট উল্‌টে হেসে বললেন—আমায় ধরছিস কেন? একজন ছোকরা ধর, দেখতেও ভালো হবে, আমোদও হবে পুরোপুরি, নয় কি?

লীলি আবদারের সুরে—আমি এত কথা জানি না, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও না গ্র্যানী

এই সময় টম সাহেব ঘাড় নিচু করে—যাতে করে মুখের ভাব কেউ ধরতে না পারে—বললে তাহলে মিঃ রয়ই ঐ কাজের উপযুক্ত দেখছি। যান না মিঃ রয়।

টমকে উদ্দেশ করে আমি বললাম—আপনার যেতে বাধা কি?

আরে আপনার বয়সে এ সব কাজে আমরা অনেক উড়েছি কিন্তু এখন যে পক্ষচ্ছেদ হয়েছে—ডানা কাটা ঘুঘু।

টমের রসিকতায় সকলেই হাসতে লাগলেন। লীলি আমার সুমুখে উঠে এসে আমার চেয়ারের হাতল দুটি ধরে, তার মুখখানি আমার মুখের কাছে এনে, অতি কোমল স্বরে বললে—চল না রয়, আমরা দুজনেই যাই।

ফিরিংগী সমাজে মিসেছি বটে, যেখানে যুবতি মেয়েকে একলা সংগে নিয়ে এসব জায়গায় যাওয়ার কোন বাধা নেই, তবু কেমন যেন সাহসে কুলল না।

কাঁচা বয়সের দোষে মন বলছে—যাও না। আবার আমার জন্মগত সংস্কার নির্দেশ দিচ্ছে—"না তোমার এক্ষেত্রে এভাবে যাওয়া উচিৎ হবে না, ভালো দেখাবে না।"

বিশেষ করে টমের উক্তিটা আজ আমার মনের দ্বিধা ও সংশয় বেশী করে জাগিয়ে দিয়েছিল।

লীলিকে বললাম—না লীলি তোমায় আমি একলা নিয়ে যেতে পারব না। যদি মুরুব্বিদের মধ্যে কেউ আমাদের সংগে যায় তবেই আমি যেতে পারি।

লীলি মুখ ঘুরিয়ে বললে—আর ইউ এ বেবী এফ্রেড অফ ইয়োর মাদার (তুমি কি কচি খোকা যে মার ভয়ে যেতে সাহস পাচ্ছ না?

—না লীলি, মাকে আমার ভয় নেই, ভয় তোমাকেই।

—কেন আমি আবার কি দোষ করলাম?

—পরে বুঝিয়ে বলব, এখন নয়। মোট কথা হচ্ছে একলা তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারব না লীলি, এর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

লীলি ম্লান মুখে চলে যেতে বুড়ী-মেম জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোল রে লীলি?

—মিঃ রয় বলছেন তোমাদের মধ্যে কোন একজন সিনিয়ার সাথে না গেলে উনি একলা আমায় নিয়ে যেতে পারবেন না।

বুড়ী-মেম—হাউ কানিং হি ইজ?

আমাদের বুড় সাহেব চোখ বুজে পাইপ টানছিলেন, চোখ খুলে বললেন—নো ডিয়ার, হি ইজ নট কানিং, আই সে হি ইজ ওয়াইজ (উনি শুধু চতুর নন, বেশ বুদ্ধিমান) তুমিই যাও না কেন ওদের সংগে।

বুড়ীর মনে প্রথমাবধিই যাবার খুব ইচ্ছা ছিল, তবে লোক দেখানো দু একবার না, না করে শেষে যেতে রাজী হয়ে গেলেন।

সে রাত্রে লীলি বেশ আমোদ করে ও বেশ মনযোগ দিয়ে অভিনয় দেখলে, আমি কিন্তু আগাগোড়া অন্যমনস্ক ছিলাম।

এইভাবে দিনে দিনে অনেক ছোট বড় ঘটনায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্টতাটা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

একদিন এই ব্যাপারের চরম সন্ধিক্ষণ দেখা দিল। সেদিন বুড়ো ডিমুজার জন্মতিথি উপলক্ষে, "লেকে" বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের দলে স্ত্রী পুরুষে বারজন।

ঠিক করা হল "জিমীর" ঘাটাল থেকে তিনখানি বোট নেওয়া হবে। প্রত্যেক বোটে একটি করে টিফিন বাস্কেট, খাবারের ঝুড়ী দেওয়া হবে ও চারজন করে আরোহী এক এক বোটে চড়ে তাদের যথা ইচ্ছা বেড়াবে।

প্রাতে আটটার সময় আমরা বোট ছাড়লাম। সেদিন আকাশ নির্মল ও বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ছিল। আমাদের নৌকাতে খৃষ্টফার নামে টমের একজন নিমন্ত্রিত বন্ধু, টম সাহেব, আমি ও লীলি।

হ্রদের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর পরিস্কার কৃত্রিম দ্বীপ আছে। প্রায় এক ঘণ্টার উপর নানাদিকে নৌকা চালিয়ে বিশ্রামের জন্য আমরা তার মধ্যে একটি দ্বীপে নামলাম।

দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটি সুবৃহৎ আমগাছের ছায়ায় একখানি বেঞ্চ্ রাখাছিল। তাতে আমরা বসতে গেলাম কিন্তু সেখানে তিন জনের অধিক বসবার স্থান সংকুলান হলো না।

আমি, কিছু না বলে তৎক্ষণাৎ গাছে উঠে একটি হেলান ডালে আমার স্থান করে নিলাম। সকলে আমার কাজ দেখে জোরে হেসে উঠলো।

লীলি। তুমি ত দেখছি একজন একস্‌পার্ট ক্লাইম্বার (পাকা গেছো)। শীঘ্র নেমে এস। না এলে তোমার বন্ধুরা এখনই তোমার একটা বদনামের সৃষ্টি করবে।

আমি। কি মংকী? আবার একদফা জোর হাসি। আমি ডালের উপর হতে লাফিয়ে জমির উপর পড়লাম। লীলি তাহা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল—এণ্ড্ এ্যান একস্‌পার্ট জাম্পার টু, লাফ দিতেও বেশ ওস্তাদ দেখছি।

—কলিকাতার হেয়ার স্কুলে চ্যাম্পিয়ান ছিলাম স্পোর্টে, কী মনে কর আমাকে লীলি ?

দশ পনর মিনিট মাত্র বসে থাকবার পর টম্‌রা দুই বন্ধুতে পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করে বললে—মিঃ রয়, আসবার সময় বুড়ো সাহেব সংগে থাকাতে বোতলটা আনা হয় নাই, সাদা চোখে কি স্ফুর্ত্তি হয় মিঃ রয়। আমরা লেক্ রেস্‌তোরায় গিয়ে একটু ড্রিঙ্ক করে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। তোমরা এই সময়টা স্বাধীনভাবে একটু আমোদ করে নাও।

আমাদের উত্তর দিবার সময় পর্যন্ত না দিয়া মুচ্‌কি হাসতে হাসতে বোটে উঠে দুজনে সরে পড়ল।

বসন্ত, প্রথম যৌবনে খেলার মাঠে লম্ফ-ঝম্প, দিঘির জলে সাতার গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠা নামার কৌশল, তারপর পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়, অর্থচিন্তা, আর সকলের উপর আমার ইকনমিকস্ এতাবৎ কাল আমাকে নারী জাতির প্রতি উদাসীন করে রেখেছিল। ইহার পূর্বে আমি কখন এরূপ হাস্য লাস্যময়ী যৌবন-পুষ্পিতা নারীর সংস্পর্শে আসি নাই।

বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন নির্জন স্থানে এইভাবে বসে থাকতে আমি অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতে লাগলাম। ফাঁকা জায়গায় উঠে এসে দ্রুতপদে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলাম,—এ ব্যাপারটি টম সাহেবের পূর্ব কল্পিত চক্রান্ত, আমাদের এই অবস্থায় ফেলে মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি করা। পরে তাহা প্রকাশ করবার ভয় দেখিয়ে আমার নিকট হতে টাকা, আর লীলির নিকট হতে টাকার চেয়েও মূল্যবান তাহার দেহের ভোগ দাবি করতে কুণ্ঠিত হবে না। লীলির প্রতি টমের লোলুপ দৃষ্টি অনেকবার আমার নজরে পড়েছিল ইতিপূর্বে!

বুঝলাম এ সময় আমার সামান্য মাত্র দুর্বলতা সকল দিক নষ্ট করবে আর এই দুর্বৃত্তদের কাজে সহায়তা করবে।

ভগবান সহায় হও, আমি কিছুতেই তাহা হতে দেব না। এ চক্রান্ত বিফল করতেই হবে। হঠাৎ মনে হল এক্ষেত্রে লীলির সহকারীতা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। তার ভাবটা কি তা একবার দেখে আসা যাক্।

মনে এইরূপ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে গিয়ে দেখি লীলি ঠিক সেই এক ভাবেই বসে নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু অসুবিধা হচ্ছে নাকি, কি ভাবছ লীলি?

—তোমার কাছে আমার অসুবিধা আর কি, রয়? তোমার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। আর শোন এ সমস্ত ঐ রাস্‌কেল টমের কীর্তি আমি সেই কথাটা ভাবছি।

—আমি তোমার এই কথা শুনে যারপরনাই সুখী হলাম, মিস্ ফিচ্‌লি, তুমি আমার সহায় থাকলে আমি ওদের উত্তম শিক্ষা দিতে পারব—ভরসা রাখি।

লীলির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—সে তার উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু দুটি আমার উত্তেজিত মুখের উপর বিন্যস্ত রেখেছে। তখনই ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম পাছে সে আমার এই উত্তেজিত ভাব দেখে অন্যরূপ কিছু ধারণা করে নেয়, কারণ তাহার মত বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে সেরূপ করা কিছুই আশ্চর্য নয়—তাহলেত অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হবে।

তৎক্ষণাৎ গাছের একটি ছোট ডাল ভাঙবার ছল করে তার সম্মুখ হতে সরে পড়লাম। মনের মধ্যে জেগে উঠল—আমি কোন বংশে জন্মেছি, কি সংকল্প নিয়ে এদেশে এসেছি; আজ যে পরীক্ষার সম্মুখীন, তা হতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে আসন্ন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ধ্বংশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

লীলির সহিত আমার সম্বন্ধটা আজই সরলভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ধীরে ধীরে জলের কিনারায় গিয়ে মুখ চোখ ভাল করে ধুয়ে

ফেললাম। বিকারের ঘোর তখন কেটে গেছে অনেকটা। ফিরে এলে লীলি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—একি করেছ, রয়? মাথা ভিজালে কেন?

—জান না আমরা হিন্দু. স্নান না করে কিছু আহার করি না, ক্ষিধে লাগছে যে?

ভ্রু দুটি সঙ্কুচিত করে লীলি প্রশ্ন করল কী রকম ক্ষিধে?

—খাবার, আবার কিসের?

লীলি ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে এবং তাহাতে একটু চটুল হাসি ফুটিয়ে স্নেহ স্নিগ্ধ স্বরে বলল—মানুষের অনেক রকম জিনিষের ক্ষুধা আছে, তা কি তোমার জানা নেই, রয়?

এই সময় আমি তার হাত দুটি আমার হাতের মধ্যে নিয়ে সহজ সরলভাবেই বললাম—"আছে কিন্তু তোমায় অন্ততঃ খেয়ে ফেলতে পারব না, কারণ আমি তোমায় স্নেহ করি, বোধহয় ভালও বাসি তাই তোমার কোন অনিষ্ট করা আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়। ঐ সময় আমার হাতের মধ্যে লীলির হাতের মৃদু শিহরণ স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম মনে আছে।

এই সুযোগে আরও বলতে লাগলাম—শুনেছি লীলি তুমি ভদ্র পিতামাতার সন্তান। আমারও ভদ্র বংশে জন্ম। আমাদের দ্বারা কি কোন হীন কাজ হওয়া উচিত? অকপট বন্ধুত্ব অপেক্ষা মধুর পবিত্র সম্পর্ক জগতে আর নাই। তোমার বন্ধুত্বের ভগ্নাংশ মাত্র পেলেও আমি নিজেকে সুখী ও ভাগ্যবান মনে করব। কেবলমাত্র বন্ধুত্ব!

লীলি তাহার হাত ছাড়িয়ে নিল না এবং সেইভাবে বহুক্ষণ নত নেত্রে অপেক্ষা করবার পর সরল ও দৃঢ় স্বরে বলে উঠল—

"ফ্রেণ্ডস্—ফ্রেণ্ডস্ ফর এভার। আমরা বন্ধু, চিরদিনের জন্য বন্ধু?"

আমায় কোন প্রশ্নের অবসর না দিয়াই চন্দ্রবাবু সেদিনের মত উঠিয়া পড়িলেন।

পরদিনের মজলিসে বসিয়া প্রথমেই দাদাকে জানাইলাম যে—আপনার বিস্ময়কর প্রণয় কাহিনীটি আগাগোড়া সমস্ত আজ লিখে ফেলেছি।

—চন্দ্রবাবু। বিস্ময়কর কিসে হল হে?

বলেন কি দাদা, শুনে তৎক্ষণাৎ আপনার পায়ের ধুলা মাথায় নিতে ইচ্ছা করছিল।

তুমি যাহাই মনে কর বসন্ত, ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নাই। রাবণ রাজা যেমন তাঁর বিশ্ব বিজয়ী ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করাতে বিফল মনোরথ হয়ে ছিলেন, এ ক্ষেত্রে টম সাহেব সেইরূপ ফলটিকে পাকবার যথেষ্ট সময় না দিয়ে অসময়ে ছিঁড়ে ফেলাতে তাহার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে নাই।

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘনীভূত হবার জন্য আরও কিছু সময় দিলে হয়ত তার মতলব হাসিল হতে পারত। এক কথায় পুরুষের বিবেক ও বীর্য আর নারীর ধৈর্য্য ও মাধুর্য্য কেহ কাহারও পায়ের তলায় তখনও পর্যন্ত নিঃশেষে লুটিয়ে পড়বার সময় পায় নাই।

ব্যাটার ইকনমিক্সের কোন জ্ঞান ছিল না কিনা? ইকনমিক্যালি নিশানা করতে পারলে গুলি অব্যর্থ—শিকার নিশ্চিত।

—তারপর দাদা?

তারপর সব সোজা কথা। ইহার ছমাস পরেই লীলির মা মারা গেলেন। লীলি নিকটেই একটি বোর্ডিংএ গিয়ে উঠল।

৩৩

লেকের সেই দিনকার ঘটনার পর হতে কি জানি কেন লীলি আমায় তার একমাত্র হিতাকাঙ্খী বন্ধু বলে ধারণা করে নিয়ে ছিল। প্রায় সকল কাজই আমার পরামর্শ নিয়ে করত। একদিন এসে জানালে যে সে লেডলর দোকানে একটা চাকরি নিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তোমার বাবা কি তোমার খরচের জন্য যথেষ্ট টাকা পাঠান না?

—বাবা যা টাকা পাঠান তার অর্দ্ধেকেই আমার সমস্ত খরচ চলে যায়।

—তবে আবার চাকরি করা কেন?

লীলি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে ম্লান মুখে জানালে—সময় কাটাবার জন্য, রয়!

শুনে আমার বুকের ভিতরটা কর কর করে উঠল। কথাটার মোড় ফিরাবার জন্য বললাম—গুড্ গার্ল! এ ক' মাসে তাহলে তোমার কিছু টাকা জমেছে বল, কি করছ এ টাকা নিয়ে?

—সেটা এখনও ঠিক করতে পারিনি। হয়ত তোমার কাছেই রেখে যাব, বাসায় টাকা রাখা সেফ্ নয়।

পরের দিন লীলি এগারশ টাকা আমায় এনে দিল। আমি তাহাকে সংগে নিয়ে ব্যাঙ্কে তার নামে একটা হিসাব খুলিয়ে দিলাম। পাস বই ও চেক বই তার হাতে দিয়া বললাম বন্ধু টাকা নষ্ট করো না; ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে। ন্যায্য খরচ করে যা বাঁচবে ব্যাঙ্কে জমা করে রেখে দিও।

লীলি তার অশ্রুপূর্ণ সকৃতজ্ঞ চক্ষু দুটি রুমালে বার বার মুছতে মুছতে আমার করমর্দন করে চলে গেল। আমি তাহার পানে চেয়ে

বেশ বুঝতে পারলাম, লীলির একজন সঙ্গীর আবশ্যক। যতদিন না তার পছন্দমত একটা বিবাহ ঘটিয়ে, উহার মুখে হাসি ফুটাতে পারি ততদিন আমি কোন মতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ইহার মাস তিন পরে লীলি এসে খবর দিল যে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, ভাল লাগল না। বললাম তবে বিবাহ করে সংসার পাত।

—সেই কথা বলতেই তোমার কাছে আজ এসেছি রয়। একজন আমায় বিবাহ করতে চায়, তাকে আমি ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি, তার কখন কোন বদনাম শুনি নাই। সেক্‌রেটারিয়েটে পাকা চাকরি মাসিক তলব চারশ টাকা। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে।

এ সম্বন্ধ আমার ভাল বলেইত মনে হয় লীলি। করে ফেল আর কি। লীলি বলল—

আমার মত দিবার পূর্বে তুমি তার চাকরি ও চরিত্র সম্বন্ধে আরও একটু ভাল করে সন্ধান নাও। তোমার মত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমি আর কাহাকেও দেখছি না। আমার বাবার দ্বারা এ কাজ মোটেই সম্ভব নয়।

আমি অতি সহজেই আমার পরিচিত ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ বাসুর নিকট হতে পাত্রের সকল খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—ছোকরাটি ভাল। কাজ কর্মও করে মন্দ নয়। রংটা কটা আছে, নামটাও সাদার পর্যায়, অল্প সময়ে উন্নতি করতে পারবে। আমি লীলিকে সকল খবর জানালাম।

লীলি আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চাইলে বললাম—আমি এ সম্বন্ধ সব রকমে ভাল বলেই বিবেচনা করি এবং সর্বান্তকরণে অনুমোদন করি। ভগবান তোমাদের সুখী করুন।

লীলির বাবা মিঃ ফিচ্‌লিকে সকল কথা জানান হলে তিনি অনুমতি দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই মিস্ ফিচ্‌লি "মিসেস্ ডিসিলভা" নাম গ্রহণ করে সংসারী হয়ে পড়ল। দশ বৎসরের কিছু বেশী তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছে।

লীলির বিবাহের তিন বৎসর পর, বয়সের সীমা অতিক্রম করায় মিঃ ফিচ্‌লি তাঁর ড্রাইভারি কাজ হতে অবসর নিলেন। প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ডের জমা অনেকগুলি টাকা তিনি পেলেন।

ঐ টাকা দিয়া আমি লীলিকে তাহাদের বর্তমান বসত বাড়িটী কিনে দিয়েছি।

বুড়ো ফিচলিকে রেল কোং এখনও একটি অল্প শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত রেখেছে। এ দেশীয় ইঞ্জিন ড্রাইভারদের কাজ শেখাবার জন্য যে স্কুল আছে তাহার তিনি প্রধান শিক্ষক। কাজের মধ্যে সকালে ঘণ্টা খানেকের জন্য—শিক্ষার্থীদের একবার গালাগালি দিয়া চলে আসেন। ইহার জন্য মাসিক সাড়ে তিনশ টাকা তলব টানেন। দিনে তিন বোতোল করে বিয়ার পান করেন ও আঠার ঘণ্টা নিদ্রা দেন। ইতি।

এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তোমায় শুনালাম বসন্ত, এখন ইচ্ছা করলে রসে ডুবিয়ে রং ফলিয়ে লিখতে পারলে হয়ত তুমি সাহিত্যিক নাম কিনতে পারবে, চাই কি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যপদেও তোমার মনোনীত হবার সম্ভাবনা রইল।

এই বলিয়া চন্দ্রবাবু হোঃ হোঃ শব্দে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।

৩৪

অনেক দিন পর্যন্ত ভাবিতাম লীলি মেমের এই বৃত্তান্তটি কি চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর জানা আছে? একদিন কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—"আচ্ছা দাদা চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গটা কি আপনার রাধারাণীর জানা আছে? আমাকে এটি যে ভাবে বলেছেন, সেইরকম করে তাঁকে বলতে কি সাহস হয়েছিল আপনার?

—ওহে তোমার বৌদিকে একথা বলবার আমার আবশ্যক পর্যন্ত হয় নি। আমার বলবার পুর্বেই লীলি, আমার চেয়েও বেশী ফলাও করে, তাঁকে সেটি শুনিয়ে গিয়েছিল।

—তাতে ফল কি হল?

—ফল অতি বিষম, গোটাকতক শ্লেষ-সূচক বাণ এসে আমার বুকে ঠেকেছিল বটে কিন্তু তাতে ক্ষুরের ধার মোটেই ছিল না, রক্তপাতের আভাষটুকুও ছিল না। "আগাগোড়া কেবল মধু।"

—আপনার এ হেঁয়ালিটিও বুঝতে পারলাম না, দাদা।

ভাবাবিষ্ট চন্দ্রবাবু কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—শোন বসন্ত লীলি আমার শত্রু নয়। আমায় সে তার গুরু ও গাইড বলে মান্য ও শ্রদ্ধা করে।

সে আমার একজন প্রকৃত বন্ধু, হিতৈষিণী আর বেশ বুদ্ধিমতী। যাতে আমাদের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয়, এমন কথা কি সে বলতে পারে!

আমার স্ত্রীর কাছে লীলি সেদিন সমস্ত সত্যকথা অকপটে বর্ণনা করেছিল। বারম্বার সে উচ্চ গলায় প্রকাশ করেছিল—যে তার চরিত্র, তার সুনাম, তার সুখ শান্তির জন্য সে আমার কাছে সর্বপ্রকারে ঋণী।

আমার স্ত্রী সমস্ত শুনে লীলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বলত ভাই সত্যকরে, সে দিন আমার স্বামী যদি তোমাকে তাঁর নিজের দিকে টেনে নিতেন তুমি কি করতে ?

ইহার উত্তর দেবার আগে অনেকক্ষণ নিশব্দে হেঁট মুখে ভাবিবার পর সে স্বীকার করেছিল—মিসেস্ রায় সে সময় আমার মনের যেরূপ অবস্থাছিল তাতে আমি বোধ হয় সে লোভ সামলাতে পারতাম না। তাঁর উপদেশে আমি সাবধান হয়ে যাই, তিনিই আমায় সেদিন রক্ষা করেছিলেন।

এখন তোমায় দেখে বুঝতে পারছি—যাঁর তোমার মত এমন স্ত্রী বর্তমান, আমার মত বাঁদরীর উপর তাঁর কেন লোভ হবে ?

এ কথায় আমার স্ত্রী বলেছিলেন—হায় ভগবান! এই তোমার বুদ্ধি ? আমার স্বামী বলেন—লীলি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। এইখানে কিন্তু ভাই তোমার ভুল হল।

—কি ভুল হল বলত ?

—আমাদের যখন বিবাহ হয় তখন ত আমি রোগা, খাটো চুল, দশ বছরের একটি village girl গ্রাম্য বালিকা। আর উনি একটি স্কুলের সাধারণ ছাত্র, বয়স পনরর বেশি হবে না। আমায় ছুবার মাত্র চোখে দেখেছিলেন আর আমি তাঁর কথার উত্তরে দু'একবার হয়ত ইয়েস অর নো,—হাঁ বা না বলতে পেরে ছিলাম।

তার পর এই সেদিন পর্যন্ত প্রায় সাত আট বৎসর আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। আমরা সম্পূর্ণ পৃথক ছিলাম। ব্যবধান কেবল মাত্র দু হাজার মাইল, আমি বম্বেতে আর উনি রেঙ্গুনে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের মধ্যে একখানি পত্র বিনিময় হয় নাই, পরস্পরের ঠিকানা পর্যন্ত জানতাম না আমরা।

—পরমাশ্চর্য লীলি বলেছিল—তুমি কি ভিয়ার আমায় আরব্য উপন্যাস শোনাচ্ছ?

—না উপন্যাস নয় প্রত্যক্ষ বাস্তব। যখন শেষ পর্যন্ত তোমায় সকল কথা বুঝিয়ে দেব তুমি সহজেই সমস্ত বুঝতে পারবে।

তোমার সহিত যখন ওঁর আলাপ হয় তখন তাঁর প্রথম যৌবন, এই সময় তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিতের ন্যায় জীবন যাপন করছিলেন সে অবস্থায় ঐ বয়সে এরূপ প্রলোভন জয় করা কি সহজ ব্যাপার!

আমি তখন কোথায় আর আমার রূপের আকর্ষণ বা কোথায় তখন? আমার এতে কোন বাহাদুরি নাই। আমি অল্পসময় মাত্র ওঁর সংস্পর্শে এসেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছি—ওঁর কর্তব্য বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। ঐ কর্তব্য জ্ঞানই সেদিন তোমাদের দু'জনকে রক্ষা করেছে বন্ধু।

লীলি আকাশের দিকে চোখ তুলে উদাসভাবে বলেছিল—"আবার বন্ধু"!

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে হাঁ বন্ধু! এই বলে মিসেস্ রায় লীলিকে সেদিন নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। সেই অবধি দেখা হলেই ওঁরা ঐ ভাবেই পরস্পরকে অভিবাদন করে থাকেন।

আমার মনে পড়িল তাই ত দেখিয়াছিলাম সে দিন বটে। বলিয়া ফেলিলাম—আশ্চর্য!

চন্দ্রবাবু সহজভাবে বলিতে লাগিলেন—আশ্চর্য? এতে আর এমন আশ্চর্যটা কী দেখলে?

—আশ্চর্য্য আপনার অধ্যবসায়, আশ্চর্য আপনার সংযম।

—এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন বসন্ত যে, আমি যখন প্রথম এই বিদেশে আসি, তখন আমার জীবনে কৈশোর ও যৌবন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। কৈশোরের শেষ স্নিগ্ধ ছায়াটুকু তখন পর্যন্ত যৌবনের

প্রকৃতিগত গুনাগুণ ও দীপ্তিকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন করে রেখে ছিল যে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর মূল্য নারীর মর্যাদা ক্রমে আমার কাছে বেড়ে আসছিল বটে, কিন্তু সেটি টাকার অনুপাতে নয়।

টাকার নিতান্ত অভাবের জন্যই আমি এদেশে আসতে বাধ্য হই, এই অভাবের সময় যখন আমার হাতে প্রথম টাকা আসতে আরম্ভ হল, তখন এই টাকাকেই প্রধান ও পরম প্রিয় বস্তুবলে আমার মনে হতে লাগল, অন্য সকল বস্তুই তখন আমার কাছে অপ্রধান ও গৌন। যাকে এক কথায় বলে টাকার নেশায় ভরপুর।

নারীর তত্ত্ব তখন পর্যন্ত আমার কাছে বিশেষ করে প্রকট হয় নি কারণ সে সময় আমি আমার যোগ্য ও মনমত কোন নারীর সংস্পর্শে আসি নি, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারনা ছিল অস্পষ্ট—তরল কুয়াশা ঢাকা সকালের রৌদ্রের মতন।

—আপনি যাই বলুন দাদা, আমার মন কিন্তু আপনার কথায় সায় দিতে পারছে না। আপনি কি বলতে চান যে যখন আপনার বিবাহিত বালিকা স্ত্রীকে দীর্ঘ সাত বৎসরের জন্য বনবাসে রেখে এসেছিলেন তখন কি তাঁর জন্য আপনার মনের কোণে একটু করুণা, একটু প্রেম বা ভালবাসা এদের কোন ভাব দেখা দিত না?

—বসন্ত এর উত্তর দিতে গেলে আমাদের পুঁথি একটু বেড়ে যাবার সম্ভাবনা হয়ত বা কিছু অবান্তর কথাও এসে পড়তে পারে।

প্রথমতঃ আমি আমার স্ত্রীকে বনবাসে রেখে আসি নি, তা হলে আমার সে কার্য ইকনমিক্স ও ধর্ম সংগত হত না। তা ছাড়া তখন তাঁর স্বামীর ঘর করবার মত বয়স ছিল না, নিতান্ত বালিকা, তারপর সে ব্যবস্থা আমার শ্বশুর মহাশয় ও আমার মার দ্বারা করা হয়েছিল।

যে পিতা মাতার আশ্রয়ে তিনি তখন ছিলেন তাঁরা সম্পন্ন সদাচারী ও তাঁদের সংস্কৃতি প্রথম শ্রেণীর ছিল বললেও কোন ভুল হয় না। আমার শ্বশুর মশাই তাঁর কন্যার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ ও শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন পরে তুমি তার পরিচয় পাবে।

তখনকার আমার মনভাবের কথা সম্পর্কে তুমি যে কথা তুলেছ তার উত্তরে কিছু গোপন না করেই বলছি, যে তখন আমার মার ও স্ত্রীর কথা ভেবে আমি অনেক সময় অস্থির হয়ে পড়তাম, সেই ভাবসমষ্টি বুকেরদিকে ঠেলে উঠে আমার সেই তরুণ প্রাণের পরতে পরতে দারুণ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করত। কিন্তু কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না বন্ধু। অবস্থা তখন সকল দিকেই প্রতিকুল। আমার ইকনমিক্স সাবধান করে দিত, বলত—"ঠাণ্ডা হও—স্থির ভব, এখনও সময় হয় নি।"

বসন্ত, এইবার তোমাকে প্রেম ও ভালবাসার কথা বলতে হলে যা আমায় বলতে হবে তা হয়ত তোমাদের ভাব বিলাসী প্রাণে অসংগত বলে মনে হবে, আমার কাছে কিন্তু সেগুলি সত্য ও পরীক্ষিত।

তোমরা সাহিত্যে ও উপন্যাসে যে সমস্ত নিঃস্বার্থ আলুনী প্রেম ও ভালবাসা নিয়ে এত মাতামাতি করে থাক, সংসারে ও কার্যক্ষেত্রে তারা কিন্তু আমার চোখে ঠিক সেরূপভাবে ধরা দেয় না। এ সকলের মধ্যেও আমি দেখি সেগুলি কেবলমাত্র ভাবের বন্যা নয়, ইকনমিক্স সেখানেও সম্পূর্ণ কাজ করে চলেছে—সেই পণ্য সেই তার মূল্য, সেই কেনাবেচা, সেই আদান প্রদান।

ইকনমিক্স বলেছে পুরুষ ও নারী তাদের পরস্পরের যোগ্যতা হিসাব করে, অর্থাৎ একের দ্বারা অপরের কতখানি সুখ ও সুবিধা হয় সেই পরিমাণে পরস্পরকে ভালবাসে। সংসারে এই যোগ্যতার তারতম্যের উপরেই অনেকটা সুখ শান্তি নির্ভর করে। কারুর কাছ থেকে কিছু পেতে গেলেই তাকে সেই পরিমাণে কিছু দিতে হয় এবং কাহাকেও

কিছু দেবার পরই তোমার মনে স্বভাবতঃই সেই পরিমাণে কিছু পাবার আশার সঞ্চার হয়, সেটা টাকায়, কার্যে, সেবায়, ভাবে, ভালবাসা এবং অন্য বহুবিধ যে কোন উপায়ের মধ্য দিয়াই হক না কেন।

এই সব দেনা পাওনা আবার যেখানে যত ন্যায্য ও পরিমিত হয় সেইখানেই ভালবাসা তত স্থায়ী হয় ও সুখের সংসার গড়ে ওঠে।

উচিত মূল্য ও সততার সহিত যে ব্যাসাতি চালান যায় তাহাই টেকসই ও পরিণামে লাভজনক হয়ে উঠে। যে নদীতে জোয়ার ভাঁটার সমতা থাকে তার জল বিকৃত হয় না। সকল ক্ষেত্রে এইটিই ইকনমিক্সের মূল সূত্র।

সকল কাজে যদি এই নীতি মেনে চলা যেতে পারত তবে হয়ত শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক এমন কি আন্তরজাতীক জীবনে এত অশান্তি যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লব ঘটত না। সংসারে ঐ ঔপন্যাসিক আলুনী একটানা প্রেমের পরিসর অতি সংকীর্ণ বলেই আমার মনে লাগে।

—হাঁ এখন আপনার মত ত শুনলাম দাদা, আচ্ছা তা'হলে আপনার পথটাও কি এই? যে লোককে সর্বদা রসচর্চা ও রসিকতা নিয়ে থাকতে দেখছি, আত্মীয় স্বজন ও আমাদের মত আশ্রিতগণ যাঁর নিকট সকল সময়ে অতি সদয় ব্যবহার, অপরিমিত ও অহেতুকী সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে আসছে তারা কী করে স্বীকার করবে যে এই রসিক ও দরদী মানুষটি সকলকে ওজন করে ভালবাসেন, দয়া করেন, সাহায্য করেন ইত্যাদি ইত্যাদি?

—বসন্ত একটি মাত্র কথা, যেটি ব্যবহার করে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পথ আমার পক্ষে তুমি সুগম করে দিলে সেই কথাটি হচ্ছে "ঐ অপরিমিত ও অহেতুকী।"

তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি যে আমি স্বজ্ঞানে অপরিমিত হারে

কাকেও কিছু সহজে দিতে চাই না, কাহার নিকট হতে সেইভাবে কিছু পেতেও ইচ্ছা করি না, ইহার দু'একটা দৃষ্টান্ত আজই তোমায় দেখিয়ে দোব। সকল দেনা পাওনার ক্ষেত্রকে পরিমিত করা এবং তাহার উচিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাই ইকনমিক্সের গোড়ার কথা। আর এরই সাধনা আমার পথ,—যে পথে আমি সর্বদা চলতে চেষ্টা করে থাকি।

তুমিই একদিন অনুযোগ করেছিলে না—কেন আমি আমার ছেলের প্রাইভেট মাষ্টারকে দশ টাকার যায়গায় তার দশগুণ টাকা দিয়া থাকি? তার সদুত্তর সেই দিন তুমি পেয়েছিলে তা বোধহয় মনে আছে।

আমাদের রামলালের জন্য একজন সাধারণ বেয়ারার মাস-মাইনের দশগুণ কেন ব্যবস্থা করা হয়েছে? হয়েছে রামলাল সাধারণ নয় বলেই, অসময়ে তার সেবা ও সাহায্য কতবার আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করেছে, তার পরামর্শ আমার উন্নতির মূলে কতদূর কাজ করেছে তাও বোধহয় তোমায় কিছু কিছু বলে থাকব।

এখন বল দেখি আমি যদি একজন সাধারণ চাকরের হারে তার মাসিকের ব্যবস্থা করতাম তবেই তাকে অপরিমিত বলতে পারতে যার ফল রামলালের মত এমন একজন অনুরক্ত লোকের সাহায্য হ'তে হয়ত আমায় বঞ্চিত করতো আর সেটা আমার ও রামলাল উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হতো না কি?

হাসি ঠাট্টা রসিকতা করে বেড়াই বটে কিন্তু তারও ত দাম পাই হে, এরা যে আমার এই কর্মক্লান্ত দেহ ও মস্তিষ্কটাকে অনেক হাল্কা ও ঠাণ্ডা করে রাখে, মনে কত না আনন্দ ও স্ফূর্তীর বিকাশ করে দেয়।

দেখছ তোমার বৌঠানটিকে কিরূপ রসিকা, ঐ বিদ্যায় তোমার দাদারও ওপর যান। বন্ধু, রসিকতার ত পাল্টা উত্তর আছে। একটি

রসিকতার যথাযোগ্য উত্তরের দাম কী সোজা কথা, সেটা ত আমি সর্বদা পেয়ে থাকি, সেই জন্যই ত তিনি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে মমতাময়ী রাণির আসনে প্রতিষ্ঠিতা।

স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত প্রভৃতি মহাশয়েরা দেশের বিজ্ঞানাগার ও অন্যান্য শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বহুলক্ষ টাকা দান করে গেছেন যার ফলে আজ দেশের ও পৃথিবীর যে পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হচ্ছে ও ভবিষ্যতে হবার আশা আছে তার উচিত মূল্য জেনেই ঐ মহানুভব পুরুষেরা তাঁদের দানের পরিমাণ ঠিক করেছিলেন, অতএব তাঁদের এই দান বিপুল হলেও ইহা পরিমিত ও দস্তুরমত ইকনমিক্স সম্মত !

মনযোগের সহিত বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝতে পারবে যে কেবল মাত্র ধন মান যশ প্রভৃতি অর্জনের জন্যই ইকনমিক্সের দরকার নয়। চরিত্র গঠনে শরীর রক্ষণে ধর্ম সাধনে ও সকল রকম উন্নতি বিধানের মূলে ইকনমিক্স অত্যাবশ্যক।

সাহস করে বলতে পারি যে যদি আরও একটু গভীর স্তর পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়ে অনুশীলন করা যায় তাতে মনে হয় যে মনুষ্য জন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল লাভের সোজা পথ আংশিক ভাবে এই ইকনমিক্স গণ্ডীর অন্তরগত।

বসন্ত, তোমার ওপর ত বড় একটা বক্তৃতা ঝাড়লাম কিন্তু এ সবার পরেও একটা মস্ত কথা আছে, আর সেটাই হচ্ছে আমাদের মত দুর্বল ও অক্ষম লোকদের আশার আলো—"সর্ব কার্যেষু মাধব" সকল কর্ম ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করে। কারণ তিনিই একমাত্র সর্বকর্মের স্রষ্টা বিধাতা ও সমাধান কর্তা।

এই যে সব উচিত অনুচিত হিসাবের কথা আমরা আলোচনা করলাম, আজ পর্যন্ত কোন লোকই এই হিসাবের খতিয়ান করে মিল করতে পারে নি, তাই সংসারে এত বিবাদ বিসম্বাদের অবসান ও হয় নি।

অতএব সংসারে আপোষ করে চলাই সুবিধা। যত চুলচেরা হিসাব খতাতে যাবে ততই সৃষ্টি হবে অনুযোগ ও অশান্তির। জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বহু গবেষণার পরও কেহই শেষ অবধি এই হিসাব সঠিক মিলিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করে গেছেন—"জীবন মিলায়ে দেখি খালি গোঁজামিল"—খালি গোঁজামিল।

"প্রেমিক বলে গোলে মালে সেরে গেছে সব ক'জনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি স্বরূপ দেখতে সবাই কানা॥"

৩৫

একদিন কোন কারণে রামলালকে আবশ্যক হওয়াতে ছাপাখানায় অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রবাবু জানিতে পারিলেন যে, রামলাল পনরদিন যাবৎ তাহার কাজে হাজির নাই।

বাসায় ফিরিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রামলাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাকরি করে আর কি করব বাবু? আপনার আশ্রয়ে খাওয়া পরাটাত চলে যাচ্ছে।

—সে কি রামলাল? তা না হয় চলে যাচ্ছে কিন্তু তার উপর মাসে মাসে আরও ঐ নগদ টাকাটা এলেও তোমার ভবিষ্যতের একটা সম্বল হয়ে থাকত।

—টাকা নিয়ে আমি আর কি করব বাবু। আমার সব থেকেও কেউই নেই। আমার ভবিষ্যত পর্য্যন্ত নেই। মাথা নত করিয়া রামলাল তাহার সজল চক্ষু বার বার মুছিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবুর স্মরণ হইল—রামলাল তার দুঃখের কাহিনী একদিন বাবুর চরণে নিবেদন করিবে বলিয়াছিল। তিনি বলিলেন—রামলাল তোমার সকল কথা আমি এখনই শুনতে চাই।

বিশেষ বিব্রতভাবে রামলাল তখন বলিতে লাগিল—চলুন আপনার শোবার ঘরে, এই খোলা যায়গায় সে সব কথা বলাত চলবে না বাবু। প্রভু ভৃত্য ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিলে রামলাল সেদিন যে বিবৃতি দিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে এই :—

"বাবু আমি আগেই আপনাকে জানিয়েছি যে—আমি শশীবাবু উকিলের মুহুরী অবিনাশ মাঝির ছেলে। বাবা আমাকেও মুহুরী করবার জন্য বাংলা ইস্কুলে ভরতি করে দিয়ে ছিলেন। কলকাতা পাটোয়ার বাগানে আমাদের বাসা, বাসার চারধারে বড় বড় দপ্তরীদের কারখানা ছিল। এই দপ্তরীরা সকলেই পূর্ব বাঙালার মুসলমান।

আমি ইস্কুল পালিয়ে এই সব কারখানার ছোকরাদের সংগে মিশে তামাক খেতাম আর বিকালে বন্ধের পর তাদের আখড়ায় গিয়ে লাঠি খেলা শিখতাম। আমার পয়লা দিনের লাঠিধরা দেখে আর আমার কব্জির হাড় পরখকরে ওস্তাদ বলেছিল—এই ব্যাটা হঁ্যাছুর পোলা পাকা খেলোয়াড় হবে।

এই সংগে দু'বছরের মধ্যে আমি রুল মেসিনের কাজ ভালরকম শিখে নিতে পেরেছিলুম।

ষোল বছর বয়সে আর একজন কোর্টের মুহুরীর মেয়ের সংগে আমার বিবাহ হয়। তাদের দেশঘর চব্বিশ পরগণা সোনারপুরে।

কলকাতাতেই আমার বিবাহ হয়েছিল তাই আমাদের দেশের লোক আমার শ্বশুর ঘরের পাত্তা জানত না।

এ থেকে চার বছরের মধ্যে হঠাৎ দু দিনের অসুখে আমার বাপ মারা গেলেন। দেশে তিনি আমাদের থাকবার মত ভিটাবাড়ী, বাগান ও সংসার চলবার মত জমি রেখে গিয়েছিলেন।

কলকাতার বাসা উঠিয়ে আমি আমার স্ত্রী, ছেলে ও একটি ছোট ভগ্নীকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে এলাম। পরে নিকটেই এক গ্রামে ভগ্নীটির বিবাহ দিই, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই সে বিধবা বেশে আবার আমার বাড়ীতে ফিরে এল। ছোট বোনটি আমার দেখতে খুব সুন্দরী ও আমাদের সকলের বড় আদরের পাত্রী ছিল, বাবু।

আমাদের বৃদ্ধ জমিদার মশাইএর কাশীতে মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর বড় ছেলে জমিদারীর ভার নিয়ে দেশে এসে বসলেন। শুনেছিলুম তিনি একজন চার পাসকরা বিদ্বান মানুষ। বাইরের ব্যাভারে তাকে ভাল লোক বলেই মনে হতো, কিন্তু স্ত্রীলোক ঘটিত স্বভাব তার বড়ই মন্দ ছিল।

ক্রমে আমার ভগ্নীর উপর তাঁর খুব ঝোঁক পড়লো। তাঁর দূতীরা আমার অসাক্ষাতে, আমার ভগ্নী "ননীর" কাছে যাওয়া আসা করত। একদিন সকালে দেখা গেল ননীর শোবার ঘরের দরজা বার দিক হতে চাড় দিয়ে ভাঙা, ননীকে ঘরে পাওয়া গেল না।

আমি আগের দিন একটি মামলার তদ্বির করতে জেলায় গেছলাম। ট্রেন ফেল করে রাত্রে বাড়ি পৌছতে পারি নি। জমিদার বাবুর কাছে নালিশ করলাম। রক্ষক যেখানে ভক্ষক হয়, সেখানে যেমন ফল হয় আমার নালিশের তিনি সেই ভাবেই ফয়সালা করলেন।

আমার স্ত্রী দুঃখে অন্নজল ত্যাগ করে তিন দিন পড়ে রইল। আমি

তখন ঘরের কোন থেকে আমার সঙ্গী পাকা বাঁশের লাঠিগাছটি হাতে নিয়ে হুলফ করে বললাম—বন্ধু, তোমায় দিয়েই আমি এই অত্যাচারের বিচার করিয়ে নেব।

আমার বাবার কাছে অনেক চোর ডাকাত তাদের মকদ্দমা সাজাতে আসত—তাদের অনেক দুষ্টুমির ছক আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতুম। এইবার আমাকেও একটা এই রকম ছক্ পাত্‌তে হল।

৩৬

আমার এক জ্ঞাতি ভাই শ' বাজারে গুড়ের কারবার করে বেশ দু'পয়সা কামাই করেছিল। তাহার দেশের বাড়ী, বাগান, আমার ভিটার সংলগ্ন ও আমাদের দুজনকার চাষের জমিও এক মাঠের সামিল ছিল।

আমি গোপনে আমার ঐ ভায়ের সংগে দেখা করে তাকে বললাম—দাদা ছোট বোনটার এই দশা হবার পর, আর আমার দেশ গ্রামে বাস করবার ইচ্ছা নেই। আরও বোধ হয় জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁরই হুদ্দোর মধ্যে থাকা সুবিধার হবে না। আপনি আমার দেশের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিন। আমি বাইরের লোক আর কাকেও দিতে চাই না তাতে আপনার অনেক অসুবিধা হবে।

যদিও আমার সম্পত্তি হাত করবার তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, তবুও মৌখিক বললেন—এ কাজ করা কি তোমার ভাল হবে, পৈত্রিক বাস্তু ভিটা।

আমি বললাম—আমারও যেমন পৈত্রিক, আপনারও ত তাই। আমরা এক বংশের সন্তান। আপনাকে দিলে আমার কোন অমঙ্গল হবে না।

এরপর তিনি সহজেই কিনতে রাজি হলেন। ভাল দাম দিয়েছিলেন তিনি আমার জমি জমার জন্য, লোকটা সজ্জন ব্যবসাদার।

দেশের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, আমরা কলকাতা হয়ে আমার শ্বশুর বাড়ী সোণারপুরে উঠে এলাম। ঐ সময় শ্বশুর বাড়ীর কাছেই এক বোষ্টোম বুড়ো বুড়ীর কোন সন্তানাদি না থাকায়, তারা দেশের বাড়ীঘর বেচে, কিছু দিন হতে বৃন্দাবন বাস করবার চেষ্টা করছিল আর ঐ কাজের জন্য আমার শ্বশুরকে মুরুব্বি ধরেছিল।

শ্বশুর মশাই আমার টাকা দিয়ে, আমার পরিবারের নামে ঐ বাড়ী ও চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি খরিদ করে দিলেন। আমি এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

দেশ ছাড়বার পর থেকে আমি গোঁফ দাড়ি কামাই নি, মাথার চুলও ছাঁটাই করি নি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম—বাবা তারক-নাথের মানসিক। বিশেষ কাজ না পড়লে পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে কোথাও বেরুতুম না। ঐ ভাবে ছমাস কাটবার পর দাড়ি চুল যখন বেশ লম্বা ও জমকাল হয়ে দাঁড়াল, তখন একটি মুসলমান ফকিরের বেশ ধরবার মত সকল সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করে ফেললাম, বাবু।

আগেই জানিয়েছি—ছেলে বেলায় পূর্ব-বাঙলার দপ্তরীদের সাথে আমার খুব মেলামেশা ছিল, তাই আমি তাদের দেশের কথা ভাল রকম বলতে পারতুম। এতেও আমার ছদ্মবেশ করার অনেক সুবিধা হল।

এই সময় আমি মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার আমাদের আদ্-গ্রামে ঐ বেশে যাতায়াত করতাম ও সেখানে জমিদার বাবুর চলা ফেরার দিকে নজর রাখতাম।

এক হাটের দিনে সেখানে গিয়ে সদর রাস্তার ধারে মস্‌জিদের সিঁড়িতে বসে থাকলাম। অনেক লোক হাটে যাওয়া আসা করল

কিন্তু কেউ আমায় চিনতে পারলে না। বুঝলাম আমার রূপটা এইবার বেশ পাকা রকম দাঁড়িয়েছে।

আমাদের গ্রামের সীমানা ও রেল ইষ্টিসনের মাঝে যে মাঠ তার উপর দিয়ে লাল ইটের পাকা রাস্তা পড়ে। ইষ্টিসন থেকে একপো আর গ্রাম থেকে আধপো দূরে ঐ রাস্তার মা:ঝ জল নিকাশের একটি পাকা সাঁকো আছে।

সেদিন শনিবার অন্ধকার রাত। ফকিরের পোষাক করে, গেঁজেতে শত্‌খানেক টাকা কোমরে বেঁধে নিয়ে, জমিদার বাবুর অপেক্ষায় ঐ সাঁকোর নীচে বসে রইলাম। অবশ্য আমার প্রধান সঙ্গী পাকা লাঠি গাছটিকে হাত গোড়ায় রাখতে ভুলিনি। জানতাম সেদিন বাবু রেলের বাবুদের ওখানে তাস খেলতে গিয়েছেন, আর তাঁর ফিরতে রাত দশটা হবে।

সময়মত বাবু আসতেছেন দেখা গেল। সামনে দারওয়ান তার এক হাতে লাঠি অপর হাতে হেরিকেন বাতি। তারা সাঁকোর উপর আসা মাত্র, আমি বেরিয়ে এসে পিছন থেকে দরওয়ান ব্যাটাকে এক ঘা ঝাড়লাম। বাতিটা তার হাত থেকে অনেকদূরে ছটকে পড়ে নিভে গেল। ফিরতে না ফিরতে আর এক ঘা মাথায়। "জান গিয়া" বলেই ভোজপুরী একেবারে লম্বা।

বাবু মশাইয়ের মুখে কথা ফোটবার আগেই তাঁর পায়ের দিকে এক ঘা দেয়াতে তিনি মাগো বলে বসে পড়লেন। পরের ঘাতে লম্বা আর নড়তে দেখলাম না। বুঝলাম সব সাবাড়।

দেখতে দেখতে দুটো মানুষ শেষ হয়ে গেল দেখে আমার বুক কাঁপতে লাগল। ভয়ে আর সেদিকে না চাইতে পেরে সোজা পূব মুখো বনের মাঝ দিয়ে ছুটতে লাগলাম। মাথার ভিতর কেবল ফাঁসি কাঠের চেহারা জল জল করছে।

কেবল মাত্র বনের কোনো ফুল আর বাঁধের পচা জল খেয়ে তিন রাত্তির হাঁটবার পর ভোর বেলা হুগলী শহরে পৌঁছলাম সেখান থেকে পার ঘাটের নৌকাতে পার হয়ে নৈহাটী ইষ্টিসনে আসতেই একখানা কলকেতার ট্রেন পাওয়া গেল, টিকিট করে কলকেতায় পৌঁছে ভাবছি আমি খুনী আসামী পুলিশ নিশ্চয় আমার বাড়ী খুঁজে বার করবে। মনে হতে লাগল যেন সকল লোকই আমার দিকে সন্দেহ চোখে তাকাচ্ছে।

দরজায় টিকিট দিয়ে বাইরে এসে দেখি আমার ছেলেবেলাকার দপ্তরী বন্ধু খালেক কতকগুলি মোট ঘাট নিয়ে কুলির সাথে দর কসাকসি করছে। আমি তার সামনে গিয়ে তাদের বাঙালভাষায় সুধালাম—কি খালেক মিয়া চিন্‌তে পারছ? সে কিছুতেই আমায় চিনতে পারলে না। পরে সমস্ত বুঝিয়ে দিলে সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ফকিরী নিয়েছ কবে থেকে?

—পরে বলছি তুমি কোথায় যাচ্ছ বল দেখি?

—রঙিনে।

—সে কোথায়?

—রঙিন জান না। জাহাজে করে যেতে তিন দিন লাগে। বড় ভারি শহর কাজকর্ম্ম ভালই মেলে। আমি সেখানে এক ছাপাখানায় রুলমেসিনে কাজ করি। সাঁঝ সকালে বাসায় বসে কিছু বাড়তি অর্ডারি কাজও করি।

—আমিও ত কিছু রুল মেসিনের কাজ জানি, আমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? খালেক একটু সন্দিগ্ধ চোখে আমার পানে চেয়ে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে বল্লে—জাহাজে পাঁচ সাত শ লোক যাবে, তোমার যেতে বাধা কি?

পরের দিন সকাল সাতটায় রেঙ্গুন জাহাজ ছাড়ল। তার আগে টিকিট করে ডাক্তার সাহেবকে হাত দেখিয়ে, জাহাজে খালেক মিয়ার পাশে গিয়ে বসে পড়লাম।

রেঙ্গুনে পৌঁছে খালেক আমায় আপনার ছাপাখানায় নিয়ে এল। প্রায় এক মাসের উপর লাগল কাজে হাতটা দোরস্ত করে নিতে। তখন হতেই মাইনে মঞ্জুর হল ও কাজে ভর্তি হয়ে গেলাম। ফাঁসির ভয়ে, আমি বেঁচে আছি কি মরেছি, এ খবরটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে পাঠাতে সাহস হয়নি হুজুর, এ নাগাৎ।

রামলালের বিবৃতি শুনিয়া স্তম্ভিত চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—রামলাল তুমি এতক্ষণ যা বললে, তাতে সকল কথা অকপটে প্রকাশ কর নাই, প্রধান কথাটি গোপন রেখে গেছ। যদি আমাকে বিশ্বাস যোগ্য বলে মনে না হয়ে থাকে, তবে এতদূর বলাও তোমার উচিত হয়নি, বাপু।

রামলাল ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল মাত্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—শোন রামলাল তোমার ইতিহাসের মধ্যে আমি দেখলাম তুমি অতি সাবধানে একটি কথা আগাগোড়া গোপন রেখে গেছ, ইচ্ছা করেই সম্ভব। তুমি ত তোমাদের গ্রামের নাম বা তোমার শত্রু সেই জমিদার বাবুর নাম, আমায় এখনও বল নাই, ঠিক কি না?

কান্নার সুরে রামলাল বাবুর পাদুটি ধরিয়া বলিল—বাবা আমি আপনার কুপুত্তুর আমার দোষ মাফ করতে হবে। আমি আপনার পা ধরে বার বার আমার দোষ স্বীকার করছি হুজুর, কেবল ফাঁসীর ভয়েই আমি এ কাজ করেছি। এখন দেখছি আপনার বুদ্ধির কাছে কেউ কিছু ছাপিয়ে রাখতে পারে না। এই গুণেই ত আমার মত একটা বনের জানোয়ারকে আপনি আপনার কেনা গোলাম করে রেখেছেন, বাবা। আর কিছু গোপন করব না আমি।

শুনুন বাবা, আমাদের আদি বাস ছিল পানাহাটী গ্রামে, জেলা বর্দ্ধমান, আর জমিদারের নাম হরমোহন দত্তের পুত্র মোহিনী মোহন দত্ত।

উত্তেজনা বিকৃত স্বরে চন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—কি বললে, পানাহাটীর মোহিনী মোহন!

বাবুর বিচলিত ভাব দেখিয়া ভীতিবিহ্বল রামলাল জিজ্ঞাসা করিল কি হল বাবা? স্থির গম্ভীর বাবুর নিকট হইতে কোন উত্তর পাইল না।

৩৭

সমস্ত দিন চন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক রহিলেন, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিলেন না। সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া সেদিন নদীর দিকে না গিয়া হাঁসপাতালের রাস্তা ধরিলেন। ডাক্তার যোগেন চৌধুরীর কোয়ার্টারে প্রবেশ করিতেই তিনি দেখিলেন—বৈঠকখানায় বসিয়া ডাক্তার একটি মাছ ধরিবার হুইল মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতেছেন।

চন্দ্রবাবুকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন—"আরে এস এস চন্দর, একখানি চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া—এখানে বসো, তারপর খবর কি? আছ কেমন বলত?

চন্দ্র। একটু হেসে ভালই আছি ডাক্তারবাবু। পরে উপহাস ছলে ধীর কণ্ঠে বলিলেন—শরীর ভাল থাকলে ডাক্তারকে আর মনে পড়ে না জানেন ত, কাজেই অনেক দিন অন্তর অন্তর আপনাদের সংগে মুলাকাত হওয়াই ভাল নয় কি, ডাক্তার বাবু?

—সেটা ঠিক, তবে আজ কি মনে করে?

—বিশেষ কিছু কাজ নয়। এদিকটায় আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলাম

তাই মনে হল ডাক্তার সাহেবকে একটা সেলাম বাজিয়ে যাই। তারপর আপনাদের সব খবর ভাল ত? ভানু কই?

"ভানু" অর্থাৎ ভানুমতী দেবী হইতেছেন ডাক্তার চৌধুরীর চৌধুরাণী। পানাহাটীর জমিদার হরমোহন দত্তর কন্যা, রামলাল কথিত মোহিনী মোহন বাবুর ভগ্নী।

চন্দ্র আর মোহিনী কলিকাতা হেয়ার স্কুলে এক ক্লাসে পড়িয়াছিলেন। এক সংগে ইউনিভারসিটির প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। পাঠ্যাবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ঐ সময়ে মোহিনী অনেকবার চন্দ্রদের দেশের বাড়ীতে আসিতেন। চন্দ্রও কয়েকবার পানীহাটীতে গিয়াছিলেন, এমন কি ভানুমতীর বিবাহের সময় বন্ধু মোহিনী, চন্দ্রকে পানাহাটীর জমিদার বাড়ীতে প্রায় এক সপ্তাহ অতি যত্নের সহিত সমাদরে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন এই সূত্রে ডাক্তার চৌধুরী ও তাঁহার পত্নীর সহিত চন্দ্রবাবুর এইরূপ ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি হয়।

চন্দ্রবাবু উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—আমাদের মোহিনীর খবর কি ডাক্তার? ডাক্তার চৌধুরী ম্লান মুখে উত্তর দিলেন—ওঃ, তুমি বুঝি জান না? মোটেই ভাল খবর নয় ভাই। সে একটা অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

—কি রকম?

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—আমি তখন ছুটিতে কলিকাতার বাড়ীতে আছি, খবর পেলাম, "কাল রাত্রে, ষ্টেসন থেকে ফেরবার পথে অন্ধকার মাঠের মাঝে কোন গুপ্ত শত্রু মোহিনীকে আক্রমণ কোরে, সাংঘাতিক রকম আহত করেছে। পরের দিন গিয়া তাহাকে বর্দ্ধমান হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম। তিন দিন পর তার জ্ঞান হল কিন্তু আঘাতের অবস্থা যা দেখলাম তাতে মনে হল বর্দ্ধমানে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা সম্ভব হবে না। তখন আমরা রোগীকে কলিকাতা মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে রিমুভ করলাম। ছ'মাস সেখানে চিকিৎসা হবার পর সে প্রাণে বাঁচল বটে কিন্তু তার ডান হাতটি চিরদিনের জন্ত অপটু, আর কোমরটি বাঁকা হয়ে গেল।

ভাবাবিষ্ট চন্দ্রবাবু, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সখেদ উক্তি করিলেন—ও হোঃ কি শোচনীয় কাণ্ড! পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—মোহিনী বিবাহ করেছিল কি ডাক্তার বাবু?

—না ভাই সে বিবাহ করে নি। এখন আর তার বিবাহ করবার মত দেহের অবস্থা নেই। ছোট ভাই রমণীর উপর সকল ভার দিয়ে সে এখন তাদের কাশীর বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসীর মত বাস করছে।

—আচ্ছা আক্রমণ কারীদের কেহ কি ধরা পড়ে নি?

—ধরা পড়বে কেমন করে বল? তার জন্ত ত কোন চেষ্টা করা হয় নি। মোহিনীর জ্ঞান হলে পুলিস ইনিস্পেকটার সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি কাহাকেও চিনতে পেরেছেন? কাহারও উপর কি সন্দেহ হয় আপনার?

উত্তরে মোহিনী বলেছিল—"অন্ধকারে কাহাকেও চিনতে পারি নি, কাহাকেও সনাক্ত করতে পারব না। কোন সাক্ষীও সে সময় উপস্থিত ছিল না। আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, আমার কারও উপর সন্দেহ হয় না। মোট কথা কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন নালিস নাই। এ বিষয়ে আপনি আর কোন চেষ্টা না করলেই আমি অনুগৃহীত হব, স্যার"।

কাজেই কোন কেস্ পর্যন্ত রুজু হয় নি, ভাই। পরে আমি মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম যে—তুমি প্রথমেই পুলিসকে এমন কথা কেন জবাব দিলে? মোহিনী ম্লান মুখে উত্তর দিল—আমার যা হবার তাত হয়েছে ভাই, এর সঙ্গে আবার পুলিসকে জড়িয়ে যন্ত্রণা

শতগুণ বাড়াবার কি দরকার? তাঁরা কত যথা অযথা কুৎসা কার করবেন, তা খবরের কাগজে ছাপা হবে, কাজ কি আর সে সব হাঙ্গামায়?

চন্দ্রবাবু মনে মনে মোহিনীর বুদ্ধির তারিফ করিয়া বলিলেন—তা হলে আজ উঠি, ডাক্তার বাবু।

—বাঃ তা কী হয় এতদিন পর এলে, তোমার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না? তাকে খবর দিয়ে আসি বলিয়া অন্দর মহলের দিকে উঠিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার গৃহিণী জল খাবারের রেকাব ও জলের গ্লাস লইয়া আসিয়া চন্দ্রবাবুর সামনের টেবিলের উপর সেগুলি রাখিয়া করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া বলিলেন—ভাল আছেন ত চন্দ্রদা? দাদার কথা ত সব শুনলেন? পরে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্ট, অদৃষ্টে যা থাকবে তাত ঘটতে হবে তার খণ্ডন করবে কে বলুন? ঠাকুর চা দিয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু। বড়ই দুঃখের কথা ভানু! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সে রাত্রে চা ও মিষ্টিমুখ করিয়া বাসায় ফিরিবার পথে চন্দ্রবাবু ভাবিতে লাগিলেন—ঘটনার কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন যে রামলালকে একথা কি ভাবে প্রকাশ করা যাইবে।

সকালে অতি সন্তর্পনে চা দিতে আসিলে রামলালের মাথায় হাত রাখিয়া চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—শোন রামলাল দুজন মানুষ হত্যার পাপ হতে ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মোহিনীবাবু মরেন নি, কিন্তু বিকলাঙ্গ হয়ে নিজের কর্মফল ভোগ করছেন। দারওয়ানটা অল্পেই খাড়া হয়ে উঠেছিল।

মোহিনী বাবু কাহাকেও সন্দেহ করেন নি। কাহারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ মোকদ্দমা দায়ের করেন নি। তুমি এখন স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পার। আমার হুকুম, আজই তোমার বাড়ীতে খবর পাঠাও। টেলিগ্রাফ্ করবার আবশ্যক নেই, ছোট গ্রাম টেলিগ্রাফ্ নিয়ে অনেক গোল হয়। আজ বেলা চারটার সময় কলিকাতার মেল বন্ধ হবে, তার আগে তুমি সবিস্তারে বাড়িতে চিঠি লিখে দাও।

আর একটা কথা তোমার ছাপাখানার কাজে এখন থেকে মন দিয়ে হাজিরা দাও, কারণ এখন নিশ্চয়ই তোমার টাকার দরকার হবে।

রামলাল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না, পরে নত হইয়া চন্দ্রবাবুর পায়ে মাথা ঘসিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিলেন রামলালের চোখের জলে তাঁহার পায়ের পাতা ভিজিয়া যাইতেছে, তিনি ইহাতে বাধা দিলেন না।

চন্দ্রায়ণ

দ্বিতীয় পর্ব্ব

৩৮

চন্দ্রবাবুর রেঙ্গুনের অজ্ঞাতবাস তখন তিন বৎসর ছাড়াইয়া আরও ছ' মাসে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে নানা উপায়ে তার রোজগার, ভদ্রভাবে চালাইবার মত, দাঁড়াইয়াছে।

এই সময় লোক সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি হওয়াতে শহরের সীমা বিস্তার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বর্মা গভরমেণ্ট, রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটী ও পোর্ট ট্রাষ্ট শহরের মধ্যে ও শহরতলিতে নূতন নূতন ল্যাণ্ড স্কিম করিয়া অনেক বাসোপযোগী, ব্যবসা ও কারখানার উপযোগী জমি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পৈত্রিক জমিদারি হারাইয়া জমি জমার তৃষ্ণা চন্দ্রকান্তের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি পরের জন্যও এই শ্রেণীর কাজ তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হইত।

আজ শহরের পূর্ব সীমানায় ঐরূপ সরকারি অনেকগুলি জমির প্লট (খণ্ড) নীলামে বিক্রয় হইবার দিন ধার্য ছিল। নিজের খরিদ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও কৌতূহল বশতঃ চন্দ্রবাবু সকলের পূর্বেই যথা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ জমির কয়েক খণ্ড জমি তাহার অত্যন্ত পছন্দমত মনে লাগিয়াছিল।

নীলাম আরম্ভ হইল কিন্তু তখনও পর্যন্ত কয়েকজন মাত্র খরিদ্দার উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রথমেই চন্দ্রবাবুর মনোনিত দুটি ফাষ্ট ক্লাস প্লট একটির পর একটির ডাক আরম্ভ হইল। কৌতুহল নিবৃত্তির ছলে চন্দ্রবাবু প্রথমেই ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ তাঁর নিশ্চিত জানাছিল যে তাঁর ডাকের অনেক উপরে দাম উঠিয়া যাইবে। কিন্তু তখন অধিক ক্রেতা উপস্থিত না থাকাতে, অথবা সম্ভবতঃ রায় মহাশয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে প্রকৃতই আশাতীত অল্প মুল্যে উক্ত দুই প্লট জমি চন্দ্রবাবুর নামেই বিড্ হইয়া গেল।

মিঃ রায় চিন্তিত মনে সই করিবার জন্য অগ্রসর হইলে অক্সেনিয়র রোজারিও সাহেব, ঈষৎ ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন—মিঃ রয় ইউ আর এ লাকী চ্যাপ, আই ওয়াজ এ বিট্ অফ মাই গার্ড ম্যান (তোমার জোর বরাত আমি একটু অসাবধান ছিলাম)।

এরূপ একটা লাভের সওদা করিয়াও, চন্দ্রবাবুর কিন্তু দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই মুল্যের শতকরা পঁচিশ টাকা জমা দিতে হইবে। বাকী টাকাও দুই মাসের মধ্যে পুরণ করিয়া দিতে হইবে। কোথায় এতটাকা পাওয়া যাবে? একমাত্র ভরসা শেঠ কৃপারামের কৃপা।

কৃপারামবাবুকে জানান হইলে তিনি মত প্রকাশ করিলেন—রয় সওদাটা ভালই হয়েছে। আমি এতে মোটা লাভের সম্ভাবনা দেখছি।

চন্দ্র। তা হলে আপনিই এটা নিয়ে নিন। আমি এই দায় থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার ত টাকা নাই যে, আমি এ কাজটা সম্পুর্ণ করতে পারব, বাবুজী।

—তা হয় না মিঃ রয়। তোমার নিজের প্রথম কাজ দিয়ে তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে। তোমার ব্যাঙ্কে কত আছে?

—যা আছে তাতে প্রথম অগ্রিম জমার টাকা কুলবে কি না সন্দেহ। বাকির জন্ত অবশ্ত আরও দুমাস সময় পাওয়া যাবে, ঐ সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। কিছু লাভ পেলেই আমি ঐ বায়নাটাই অন্ত কাহাকেও ট্রানস্‌ফার করে দিতে পারি।

—পরের কথা পরে হবে। তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালানস্‌ যা আছে তার অর্দ্ধেক আমায় কাল এনে দিও। আমি বাকী টাকার ব্যবস্থা করে দিব, কেমন?

—বহু বহু ধন্তবাদ, শেঠজী।

পরদিন চন্দ্রবাবু যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন তাহার উপর নিজ তহবিল হইতে কৃপারাম শেঠ বাকী তিনহাজার টাকা দিয়া প্রথম ডিপজিটের সংকট উদ্ধার করিয়া দিলেন।

আজ আবার দেওয়ালি সিন্ধীদের কেন, সমস্ত ভারতের পশ্চিম অংশ বাসিদের নূতন বৎসরের প্রথম দিন। কৃপারামবাবুর গদিতে বিশেষ উৎসবের আয়োজন। বড় হল ঘর হইতে আপিসের আসবাবপত্র সরাইয়া দিয়া ঘর জোড়া কার্পেট বিছাইয়া মেঝেতে ঢালা বিছানা। সমস্ত জানালা দরজায় দামি পর্দা ঝুলিতেছে। বাহিরের বারান্দায় রাত্রের জন্ত সুদৃশ্য আলোকমালা ও তার মধ্যে মধ্যে নানাবর্ণের চাইনিজ লণ্ঠন টাঙ্গান হইয়াছে। ভিতর কামরায় মিষ্টান্ন, আতর গোলাপ পান সমূহের প্রচুর আয়োজন।

বেলা চারটা হইতেই খাতক ব্যাপারী, নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধবগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। অভ্যাগত ভদ্রমহোদয়গণের সংবর্ধনা আদর আপ্যায়ন শেষ হইতে প্রায় রাত্র নটা বাজিয়া গিয়াছে।

রাত্রে আহারের পূর্বে শেঠজীর একটু মডারেটলি ড্রিঙ্ক করা অভ্যাস আজ উৎসবের পর তিনি একটু ক্লান্ত হইয়া গাড়ি বারান্দার খোলা ছাতে

একখানি আরাম চেয়ারে শয়ন করিয়া একাকী বিশ্রাম করিতেছিলেন। পার্শে টিপয়ের উপর অর্দ্ধ পীত হুইস্কি সোডার গ্লাস। চন্দ্রবাবু সন্তর্পণে সেখানে উপস্থিত হইয়া শেঠজীকে সিন্ধী ভাষায় ও কায়দায় নববর্ষের অভিবাদন জানাইলেন। গত তিন বৎসরের ঘনিষ্ঠতায় তিনি মোটামুটি কথাবার্ত্তার মত ঐ ভাষাটা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

—হ্যালো রয় এত দেরী কেন? আজ তোমাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে ব্যাপার কি?

বেয়ারা চেয়ার আনিয়া দিলে চন্দ্রবাবু তাহাতে বসিয়া বলিলেন—না শেঠজী সেরূপ বিশেষ কিছু নয়, ধন্যবাদ। আপনাকে এখন একলা পাওয়া যাবে বলেই আজ আমি একটু বিলম্ব করে এলাম। পরে অল্পকাল থামিয়া বলিলেন—সে দিন যে আমায় তিন হাজার টাকা দিলেন, তার জন্য ত একখানা হ্যাণ্ড্‌নোট আমার দেওয়া উচিত। আজ শুভদিন তাই সেটি লিখে আপনাকে দিতে এনেছি, এই নিন্।

—চলুন ঘরের মধ্যে, দেখে নিতে হবে ত। উভয়ে ঘরের ভিতর আলোতে আসিলে শেঠজী মনোযোগ সহকারে দলিল খানি পড়িয়া বলিলেন এটা ঠিক মত লেখা হয় নাই, আমি একখানি লিখিয়ে রেখেছি, আজ শুভদিনে সহি করে দিন।

এই কথা বলিয়া তিনি নিজের দেরাজের ভিতর হইতে একখানি সাধারণ ভাউচার (Voucher) চন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া তাঁহাকে সহি করিয়া দিতে বলিলেন। চন্দ্রবাবু পড়িয়া দেখিলেন সেটি মোটেই হ্যাণ্ডনোট বা ঐ জাতীয় কোন দলিল নয় কেবল মাত্র একখানি আপিসের সাধারণ পে-ভাউচার (Pay voucher) তাহাতে ইংরাজি ভাষায় লেখা ছিল যথা—

হিঃ মিঃ চন্দ্রকান্ত রায়

ইংরাজী ১৯··· সাল প্রথম বৎসরের আদালতের কাজের

পারিশ্রমিক মাসিক ৫০৲ হিঃ—৬০০৲

,,	,,	দ্বিতীয় বৎসরের	ঐ	১০০৲—	১২০০৲
,,	,,	তৃতীয় বৎসরের	ঐ	১০০৲—	১২০০৲
				মোট	৩০০০৲

মোঃ তিন হাজার টাকা মাত্র পাইলাম।

চন্দ্রবাবু অতীব বিস্ময় সহকারে বলিলেন—একি শেঠজী?

—কেন, কিছু অন্যায় কাজ হয়েছে কি?

—আমি ত আপনার নিকট হতে মাহিনা নেব না বলেছিলাম।

—তোমায় একাধিকবার বলেছি—আমি কাকেও মুফত ব্যাগার খাটাই না। প্রথম মাস হতেই তোমার হিসাবে এই টাকা আমার খাতায় জমা হয়ে আসছে। আজ খরচ লিখে, তোমার দরকারের সময় দেওয়া গেল, বুঝতে পারলে?

আর একটি কথা তোমাকে বলে রাখি মিঃ রয় যে—আমাকে না জানিয়ে তুমি কাহাকেও এই জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করো না। শহরতলীর এই সব ইম্প্রুভড্ (improved) জমির চাহিদা যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আমার বিশ্বাস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খরিদ দামের দুগুণ বা তারও অধিক দাম পাওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য নয়। আমি এইরূপ অফার এখন হতেই পাচ্ছি।

চন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অসংখ্য তারকা খচিত সেই অমানিশার আকাশের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে আবেগপূর্ণ ভারি গলায় বলিতে লাগিলেন—শেঠজী বাল্যকালে চক্রান্ত-কারী শত্রুগণের উৎপীড়নে বাধ্য হয়ে স্বদেশ ও স্বজন ছেড়ে এই

সুদুর বান্ধবহীন বিদেশে আসতে হয়েছে। এ পর্য্যন্ত আমার সংকল্প ও আন্তরিক প্রার্থনা কেবলমাত্র ভগবানের নিকট নিবেদন করে আসছি। দ্বিতীয় আর কাকেও জানাই নি। তাই বোধ হয় এখানে পৌঁছবার এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবান, আপনার ন্যায় একজন উদার হৃদয় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটিয়ে দিয়েছেন। এখন বেশ বুঝছি এ সকলই তাঁর সর্বতোমুখী দয়া। আপনার ঋণ আমি...

এই সময় নিজের ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া ইঙ্গিতে চন্দ্রকে থামাইয়া দিয়া শেঠজী আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন—বাস্ নট এ ওয়ার্ড মোর—আর একটি কথাও না। পরে এক হাতে চন্দ্রবাবুর হাত ধরিয়া খানা ঘরে প্রবেশ করলেন।

উভয়ে আহারে বসিলে কৃপারাম বাবু হঠাৎ বলিলেন "শোন রায়, আজ হতে তিন বৎসর পূর্বে একদিন একটি অসাবধান মূহূর্তে তুমি বলে ফেলেছিলে যে—এক সময়ে তোমাদের আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন ছিল। তোমরা অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলে। তোমার স্বভাব ও চাল চলন পর্য্যবেক্ষণ করে আমার এই বিশ্বাস—যে সম্ভ্রান্ত বংশেই তোমার জন্ম তোমার বাল্যকাল সৎসঙ্গে ও সুশিক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে।

তারপর এতদিন তুমি তোমার পরিচয় অতি সাবধানে গোপন রেখেছ, তা আমি সময়ে সময়ে লক্ষ্য করে আসছি, আজও তুমি মনের আবেগে তোমার পূর্ব ইতিহাসের কিছু ব্যক্ত করে ফেলেছ। যদি বিশেষ কোন আপত্তি বা গোপন করবার মত কিছু না থাকে তবে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করতে কোন দ্বিধা বোধ কর না।

কোন বিশেষ কারণে তোমাকে আমার আরও নিগূঢ়ভাবে জানা আবশ্যক এবং ইহাও বলে রাখি তাহাতে তোমার ভালছাড়া কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

চন্দ্রবাবু বলিলেন—শেঠজী আপনি আমার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, অগ্রজ ও গুরুর তুল্য। আপনার উপদেশ, সহায়তা ও কার্যপদ্ধতি আমার অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছে। এখন যে কোন রকম কাজ হোক, তা করতে আমার সাহসের অভাব হবে না বোধ হয়। আপনার নিকট আমার গোপন করবার কিছুই নাই। যদি আমার পূর্ব কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করেন, তাহা ব্যক্ত করতে আমি এখনই প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা মনটা একটু সরস করে নেয়া যাক, আর মাথাটাও একটু সাফ করে নিলে মন্দ হয় না, কেমন? এই বলিয়া শেঠজী একটু বাঁকা চোখে হাস্য সহকারে নিকটস্থ স্ফটিক পাত্রপূর্ণ সফেন পানীয় হইতে বেশ একটা মোটা রকম সিপ্ গলাধঃকরণান্তর, চন্দ্রবাবুর ইতিহাস শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। চন্দ্রকান্ত রায় ধীরে ধীরে নিজের কাহিনী যথাযথ বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

শেষ পর্যন্ত আট আনা মাত্র সম্বল লইয়া শীতের সন্ধ্যায় চন্দ্রকান্তর রেঙ্গুন বন্দরে অবতরণের কথা শুনিতে শুনিতে বিষম বিস্ময় ও উত্তেজনার সহিত বৃদ্ধ কৃপারাম চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চন্দ্রবাবুকে আলিঙ্গন বদ্ধ করলেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"Exeellent! You are my second edition—You will be my second edition—God bless you."!

(তুমিই আমার দ্বিতীয় সংস্করণ, তুমিই হবে আমার দ্বিতীয় সংস্করণ, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন)

রয়! তোমার জীবনের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ আমার সহিত ঠিক ঠাক্ মিলে গেছে। প্রার্থনা করি জীবনের পর পরিচ্ছেদগুলিতে তুমি আমা অপেক্ষা অধিক সফলতা, সম্পদ ও শান্তিলাভ কর।

—আপনার আশীর্বাদ সফল করবার জন্য চন্দ্র রায় জীবনান্ত চেষ্টা করবে।

রাত্রি তখন সাড়ে বারটা চন্দ্র উঠিয়া বলিলেন,—"আজ এই পর্যন্ত স্যার। গুড্‌বাই।"

—গুড্‌বাই, রয়।

সে রাত্রে চন্দ্রবাবু নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। নানারূপ জল্পনা তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া রাখিল।

ক্রমান্বয়ে এক সপ্তাহ কাল চন্দ্র শেঠজীর গদিতে অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে কৃপারামবাবু চন্দ্রের অপিসে দুই দিন খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন তার কোন অসুখ হয় নাই। রায় বাবু দুই এক ঘণ্টামাত্র আফিসে থাকিয়া নিজের দৈনিক কাজ সারিয়া বাসায় চলিয়া যান, এমন কি তাঁহার অভ্যস্ত ইভনিং ওয়াকে বাহির হইতে আজকাল কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

আর, কেহ ইহার কারণ দেখিতে না পাইলেও কিন্তু কৃপারাম কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে খুসী হইয়াছিলেন, ভাবিলেন ছোকরা বয়স, ইনজেকসানটা কিছু জোরাল রকম হয়েছে, সামলাতে সময় দিতে হবে।

৩৯

রেঙ্গুন সহরের ঠিক মধ্যবর্তী ও সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাস্তা সুলে-প্যাগোডা রোডের পশ্চিম ফুটপাথের উপর চন্দ্রবাবুর আপিস বাড়ী। তাহারই দক্ষিণদিকে ক্রমান্বয়ে কৃপারাম বাবুর ফটোষ্টোর, তারপর রেঙ্গুণের তৎকালীন Health officer (হেল্‌থ্‌ অফিসার) বিখ্যাত ডাক্তার দে সাহেবের ডাক্তারখানা,—"বি দে এণ্ড্‌ কোং।" ইহার পরেই শহরের কেন্দ্রস্বরূপ সুমহান অনুপম সুন্দর পবিত্র বৌদ্ধ মন্দির "সুলেফায়া" এই দেব নিকেতনের চারিটি প্রধান সিংহদ্বার হইতে চতুর্দিকে চারিটি সুপ্রশস্ত প্রধান রাস্তা শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে।

এরূপ সুন্দর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থিত আপিস বাড়ীতে তেতলায় কর্মচারীদের একটি মেস্‌ ছিল। ইচ্ছা করিলেই চন্দ্রবাবু অল্প খরচে সেখানে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তান চন্দ্রকান্ত সে দলে কিছুতেই মিশিতে পারিলেন না। বাঘের বাচ্চা কাঁটাবনে, হীম শীতল পর্বত গুহায় অনশনে বাস করিবে তবুও সুখসাধ্য ও সুনির্মিত গোশালায় কিছুতেই থাকিতে চাহিবে না।

অপেক্ষাকৃত ভদ্র পল্লী মধ্যে সম্পূর্ণ কাষ্ঠ নির্মিত দোতলা ছোট বাড়ী, খোলার চাল কিন্তু উত্তম শিলিং বিশিষ্ট। নিচের তলায় থাকেন একজন সস্ত্রীক মাদ্রাজী কেথ্‌লিক ক্রীশ্চান ভদ্রলোক, ইনি স্থানীয় ছোট আদালতের উকিল, অতি নিরীহ মানুষটি।

দোতলায় কাঠের সিঁড়ী দিয়া উঠিয়া পর পর তিনটি কামরা সবগুলিই আলোক বাতাস যুক্ত। ঘরগুলি প্রশস্ত আর আগাগোড়া

সিলিং পর্যন্ত পরিষ্কার পেন্টকরা, দেখিতে অনেকটা জাহাজের কেবিনের মত ; অবশ্য সেরূপ ছোট নয়।

বিকাল বেলা পাঁচটা—ইহার দোতলার সামনের প্রথম ঘরটিতে আমাদের চন্দ্রবাবু একটি ছোট টেবিলের উপর পা দুইটি তুলিয়া সামনের চেয়ারে অন্যমনস্কভাবে সিলিংএর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর রাশিকৃত লেখা কাগজ ছড়ান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আবার কতকগুলি ঘরের মেঝেতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কাঠের সিঁড়ীতে জোর পায়ের শব্দ হইবামাত্র তাঁহার বন্ধু পান্নালাল সশব্দে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পানুবাবু বলিয়া উঠিলেন—"কি হে, তোমার ব্যাপার কি চন্দর, বোধ হয় বছর খানেক এ শহরে কেউ তোমায় দেখতে পাচ্ছে না।"

—এক বছর কেন দশ বছর বলতেও ত তোমার কোথাও বাধতো না, এত বাড়াতেও তুমি পার, পানু বাবু!

—বিকালে বেড়ানটাও ছেড়ে দিয়েছ। থাকত একলা প্যাঁচার মত, আশে পাশে কোন খ্যাঁদা ছুঁড়ীর প্রেমে পড়ে যাওনি ত হে? চন্দ্র হাসিয়া বলিল রেঙ্গুণের বাবুদের পক্ষে সেটাও ত এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় হে, হয়ত পড়েইছি।

টেবিলের উপর ও ঘরের মেঝেতে ছড়ান লেখা কাগজগুলির দিকে নজর পড়ায় পান্নাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এ সব কি করেছ হে?

চন্দ্র হাসিয়া বলিলেন আঁক্ কষেছি, সেকেণ্ড গ্রেড এডভোকেট শিপ্‌-একজামিনটা দেবো মনে করেছি।

—"চালাকি, এড্‌ভোকেটশিপ একজামিনে বুঝি আঁকের পেপার থাকে? আচ্ছা দেখ চন্দর সত্যই তোমার যে রকম পড়াশুনার বাতিক,

আমার বিশ্বাস ঐ একজামিনটা চেষ্টা করলে তুমি সহজেই পাস করে যেতে পার।

—"তা হলে বারমিজ ল্যাংগোয়েজটা সহজে পাস করবার জন্ত একটি সুন্দরী দেখে ওয়াকিং ডিসনারি জোগাড় কার দাও। তোমরা হলে এদেশের ডোমিসাইল্ড লোক, অনেক জানা শুনা আছে ত" এই বলিয়া চন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

—ওহে চন্দর শুনেছ ভিসুভিয়াস আবার প্রচুর কাল ধোঁয়া ছাড়ছে, ভীষণ ইরাপসান হবার খুবই সম্ভাবনা।

—কি করে পানুবাবুর সেটা জানা হল? "ভ্যাটিকেন" থেকে কেবল (cable) করে মশাইকে কি সাদরে ডেকে পাঠিয়েছে, এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে?

—কেন, আজ সকালের কাগজে কালো অক্ষরে লিখেছে দেখনি?

—আমি ও খবর গুলো পড়ি না ভাই। ও সব জিনিস সুদূর উদ্দেশ্য নিয়ে অতিরঞ্জিত হয়ে, রয়টারের ভিয়ানশালায় সরকারি অর্ডারমত পাক হয়, আর তাই দেশ বিদেশে বিক্রি হয়। এসব জেনে বর্ত্তমানে আমাদের কিছুমাত্র লাভালাভ নেই।

হাঁ, ভিসুভিয়াস্ পাহাড়টা যদি আমাদের বড় পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে থাকত তবে কিছু ভাবনার কারণ ছিল বটে, তাহলে' হয়ত তার ঐ উৎপাতে ছাই পাঁশ পড়ে বৈকুণ্ঠ রায়ের দিঘিটা বুজে যেতো আর তাঁর পোষা বড় বড় নামজাদা মাছগুলো মরে যেতেও পারতো। চন্দ্র সাবধান হইয়া ভাবিলেন, এতটা বলিয়া ফেলা বোধ হয় এখানে ভাল হইল না।

প্রসঙ্গটি ফিরাইবার জন্ত বলিতে লাগলেন—যাদের দেশে এই উৎপাত হচ্ছে—তারা স্বাধীন জাত। সেখানে যথা সময়ে সকল রকম সাবধানতা নেওয়া হচ্ছে, সকল রকম সুবন্দোবস্ত করা আরম্ভ হয়েছে।

সেটা কি আমাদের দেশ—যেখানে বছর বছর ম্যালেরিয়াতে লাখ

লাখ লোক মরছে। বন্যাতে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কত শত গ্রামবাসি সর্বহারা হয়ে পথে ও গাছতলায় আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু একটা মজা নদীর মোহনা খুলে দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করলে হয়ত এই প্রভূত প্রাণ ও ধনহানিটা বেঁচে যেতো।

কই তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি? অথচ সরকারের ইরিগেসন ও পাবলিক্ হেলথ বিভাগের বাজেটে কোটি কোটি টাকা খরচা করা হচ্ছে, প্রতি বৎসর!

দেশের লোকের জন্য পেটভরা ডাল ভাত, লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড়, শীতাতপ হতে রক্ষা পাবার জন্য স্বাস্থ্যকর একটু আশ্রয়, পীড়িতের সস্তায় সুচিকিৎসা এই গুলির দিকে নজর দাও।

ভিসুভিয়াস এসব দিতে পারবে না। সে জানে না দিতে জীবন, সে জানে শুধু দিতে মরণ।

—হাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ ভাই, একটা নাতী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পানুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ঐ যে বললে বৈকুণ্ঠ রায়ের দিঘি সেটা কোথায়?

বাধ্য হইয়া চন্দ্রবাবুকে বলিতে হইল। "বাংলাদেশে, হুগলী জেলায়, গ্রামের নাম বললে তুমিত বুঝতে পারবে না। জেলা কাকে বলে জান কি?"

পানু হাসিয়া বলিল—হাঁ হাঁ জেলা বলে ডিসট্রীক্টকে।

—"তবু ভাল বাবার জন্মস্থানের ত কোন খবর রাখনা, বললেও ঠিক ধারণা করতে পারবে না ভাই। তোমার বাংলাদেশের ধারণাটা ত বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস থেকে?

প্রায় তাই চন্দর। যে কবার গিয়েছি, কলিকাতায় মামার বাড়ীতেই কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু তবুও বাংলার পল্লীর কথা, সেখানকার পুরাতন জমিদারদের কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। যদি জানা থাকে

তবে ঐ বৈকুণ্ঠ রায়ের গল্পটা একটু চালাও না ভাই, এই বাদলার বাজারে বসে শোনা যাক।

৪০

চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিলেন—হাঁ, তাঁর গল্পটা একটু ইন্‌টারেস্‌টিং বটে। রায় মশাই ঐ গ্রামের একজন জমিদার ছিলেন। তিনি অনেক টাকা নষ্ট করে ঐ বিশাল পুকুর অর্থাৎ দিঘিটা কাটিয়েছিলেন, তার উত্তর পাড়ে খুব লম্বা চওড়া চাতালওয়ালা পাকা ঘাট অপর তিন দিকেও আর তিনটি—অপেক্ষাকৃত ছোট ঘাট।

সংক্ষেপেই বলছি; তিনি প্রতি বৎসরই ঐ দিঘিতে মাছের পোনা ছাড়াতেন কিন্তু কখন মাছ উঠাইতেন না। শুনেছি তাই বিস্তর বড় বড় মাছ দিঘিটায় সর্বদা ভরা থাকতো।

তার মধ্যে কর্তার কতকগুলি অতিকায় ও চিহ্নিত মাছ ছিল, তারা নাকি প্রতিদিন কর্তার হাত থেকে খাবার খেয়ে যেতো। তাদের কারো নাম ছিল মোনা কারও ধোনা, সোনা ভেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বর্ষাকালে রায় মশাই বন্ধু বান্ধবদিগকে ছিপে মাছ ধরবার জন্ম নিমন্ত্রণ দিতেন, তখন বহু আড়ম্বরের সহিত মাছ ধরার ব্যাপার চলত। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেহ ছিপে মাছ উঠাতে না পারলে কর্তা অন্ত পুকুর থেকে জাল দিয়ে মাছ ধরিয়ে তাঁদের থলিতে ভরে দিতেন। উঃ কি বিষম অর্থনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

কেন তুমি হলে কি করতে বন্ধু? পানুবাবু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি? আমি হলে দিঘির পাড়ে কাকেও ঘেঁসতে দিতাম না। বৎসরান্তে মাছগুলি ছেঁকে তুলে বিক্রমপুরে পাঠাতাম ও তার মূল্য স্বরূপ

থলিভরে রজত খণ্ড আমদানি করে সিন্ধুক জাত করতাম। এখন হলে হয়ত "চেটী আইয়ারের গদিতে," নয়ত ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলে জমা হতো কারণ এইটিই হচ্ছে খাঁটী ইকনমি।

—তারপর?

—তারপর আরও শুনতে চাও নাকি?

—বল না ভাই সে দীঘি আছেত এখনও?

—হাঁ, দীঘিটি বর্ত্তমানে কচুরি পানা আর তাঁর জ্ঞাতিবর্গের জঙ্গলে ভরাট হয়ে গ্রামে ম্যালেরিয়া পরিবেসন করছে, মাছের মধ্যে কিছু হরিজন, সিডিউল কাষ্ট শোল লেঠা, খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

—কেন, রায় মশাইর কি হল?

—ইকনমিক্সে ভুল করলে লোকের যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ এক কথায় ধ্বংস।

—রায় মশাই তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভাইপোকে তার সমস্ত পড়ার খরচ দিতেন কারণ তাদের আর্থিক আয় মোটেই সচ্ছল ছিল না। এরূপ সাহায্য পেয়ে মেধাবী বালক একজন পাকা উকিল হয়ে উঠলেন।

দেখ এইখানেই রায় মহাশয়ের পলিটিকেল ইকনমিক্সের প্রধান ও প্রথম চালে ভুল হয়ে গেল, কেন না কোন প্রতিবাসিকে অযথা বেড়ে যেতে সাহায্য করা ও সুবিধা দেওয়া সমূহ বিপজ্জনক। দেখ না জার্মানি যেই একখানি ড্রেড্‌নট ভাসালে বৃটেন অমনি দু'খানির পত্তন দিলেন।

তোমার দেওয়া অন্ন খেয়ে, হাতে বল পাওয়ামাত্র তোমারই প্রতিবাসী, দয়াল বন্ধুপ্রবরেরা, সেই হাতেই সব প্রথম তোমারই টুঁটি টিপে ধরবে।

এমন কি তোমার গৃহ সন্নিহিত একটা গাছকে বাড়তে দিলে সে

প্রথমেই শিকড় চালিয়ে তোমার বাড়ীর বনেদ ফাটিয়ে দেবে, অতিরিক্ত ডালপালা বিস্তার করে তোমার আলো বাতাস আড়াল করবে, আবার ঝড়ে ভেঙ্গে পড়বার সময়ও তোমায়ই ঘরের ছাদে পড়ে তোমায় বিপদাপন্ন করে তুলবে। এইটিই হল সনাতন পলিটিক্স ও জীবন্ত ইকনমিক্স।

—আরে ছাড় তোমার ইকনমিক্স চন্দর, বল তারপর কি হল?

—ইকনমিক্স ছাড়লে কি নিয়ে বাঁচবো হে। ইউনিভারসিটিতে ইকনমিক্স ক্লাস পর্যন্ত এগুতে পারি নি, তাই টাকা দিয়ে কেনা ছাপান পুঁথিগত ইকনমিক্স পড়া ভাগ্যে ঘটে উঠে নি, সেইজন্যই ত প্রাণ দিয়ে কেনা ইকনমিক্সের সাধনা নিয়ে বেঁচে আছি, ব্রাদার।

তুমি ধনাঢ্য কেমব্রিজ ফেরৎ কনসালটিং ইনজিনিয়ার সাহেবের বড় ছেলে আজন্ম কোন অভাবের সম্মুখীন হও নি, তুমি এর বুঝবে কী?

—এটি বুঝতে পারবে সেই, যে রামচন্দ্রের ন্যায় রাজপুত্র হয়েও—কবির ভাষায় বলতে গেলে—"ধনহীন বনবাসী বিধি বিড়ম্বনে!"

—তারপর?

—তারপর আর কি, ঐ ভাইপো প্রাণকৃষ্ণ রায় বাংলার বাইরে কোন প্রদেশে গিয়ে কিছু মোটা টাকা উপার্জ্জন করতে পেরেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তাঁর প্রথম কার্য হল তাঁরই মত কতকগুলি সহযোগীদের সহিত চক্রান্ত করে পূর্ব উপকারী বৈকুণ্ঠ রায়ের জমিদারি লাটের নিলামে অতি অল্প মুল্যে বেনামীতে কিনে নেওয়া।

তখন বৈকুণ্ঠ রায় নেই—তাঁর পুত্র নীলকণ্ঠ রায় মারা গিয়েছেন—নাবালক পৌত্র সর্বস্বান্ত—দেশত্যাগী—নিরুদ্দেশ; এই বলিতে বলিতে চন্দ্রবাবু উচ্ছাসবেগে হাঁপাইতে লাগিলেন তাঁহার দুই বাষ্পপূর্ণ চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি জামার হাতটায় চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—আর কিছু বলবার নাই বন্ধু।

কিছুক্ষণ চন্দ্রবাবুর মুখের প্রতি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পান্নাবাবু বলিলেন—মাপ কর ভাই চন্দর, তোমার ভাব গতিক দেখে আমার নিশ্চিত ধারণা, তুমিই সেই জমিদার বৈকুণ্ঠ রায়ের নিরুদ্দিষ্ট পৌত্র চন্দ্রকান্ত রায়। আর লুকুতে পারবে না। কাহিনীটা কিন্তু বড়ই করুণ!

বিপুল উত্তেজনা সহকারে চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—চন্দ্র রায় এই করুণকে অরুণ রাগ রঞ্জিত করবেই করবে এই তার প্রাণান্ত পণ, জেনে রাখ!

ইহার পর উভয়ে অনেক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর চন্দবাবুর "কম্বাইণ্ড"—কম্বাইণ্ড বলে সেই একমাত্র চাকরকে যে রান্নার কাজ হতে বাবুর অন্যান্য সকল রকম সংসারের কাজ একলা করে—সেই শ্রীমান রামলাল আসিয়া খবর দিল "চা দেওয়া হয়েছে।"

এইবার চায়ের জন্য দুই বন্ধুতে পাশের কামরায় ঢুকিবামাত্র ঠিক সামনেই তাকের উপর সযত্নে রক্ষিত একটি খবরের কাগজের ফাইল দেখাইয়া পান্নাবাবু একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিলেন—তবে যে এতক্ষণ বড় বাহাদুরি করা হচ্ছিল—আমি খবরের কাগজ পড়ি না তবে অত যত্ন করে ওগুলিকে ফাইল করে রাখা হয়েছে কেন, বন্ধু?

ওটা খবর কাগজের ফাইল মোটেই নয়, ব্রাদার। স্রেফ বিজ্ঞাপন "দি বৃটিস বর্ম্মা এডভাইটাজার—(The British Burma advertiser)" বিলাতি বা দেশী, যাকে তোমরা নিউস্ বলে থাক, ওটাতে তা মোটেই পাবে না। দেশী ও বিলাতী বিজ্ঞাপন ছাড়া পোষ্টাল নোটীস, জাহাজের টাইম টেবল, বাজার দর প্রভৃতি অনেক দরকারি জিনিস পাবে।

বিশেষ করে গভর্ণমেণ্ট আজকাল নিউ স্কীমের যে সব টাউন-ল্যাণ্ড নীলামে বিক্রি করছে, তার নিলামের তারিখ, ম্যাপ, প্লট নম্বর, পূর্ব পূর্ব নীলামে কোথাকার কোন জমির কত টাকা পর্যন্ত বিড্

উঠেছিল, এই সমস্ত খবর পাওয়া যায়। এইগুলি আমার ভারি ইন্‌টারেস্‌টিং লাগে।

শুনিয়া পান্নাবাবু একটু অন্যমনস্কভাবেই বলিয়া ফেলিলেন—কেন হে জমি কেনা বেচার ব্যবসা আরম্ভ করেছ না কি?

চন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন কি বললে জমি কেনা বেচার ব্যবসা! জমি কেনা বেচার ব্যবসা!" বাস ঠিক হো গিয়া। সাবাস্ সাবাস্ পান্নালাল—স্বনামধন্য বিখ্যাত কনসালটিং ইন্‌জিনিয়ার শঙ্করলাল মিত্রের ছেলে বটে তুমি। তোমার আঁকের মাথা ভাল না হবেই বা কেন?

আমি চন্দ্রকান্ত, সাত দিন ধরে চৌদ্দ কাপ চা খেয়ে ও দু'দিস্তে কাগজ নষ্ট করে যার আন্‌সার এখন পর্যন্ত বার করতে পারলেম না, আর তুমি কিনা প্রথম চায়ের পেয়ালাটা হাতে ধরবা মাত্রই তার রাইট আন্‌সার বার করে দিলে।

—ও সব পাগলের মত আবল তাবল কি বলছ বলত, তোমার হলো কি চন্দর?

—তাড়াতাড়ি শোনবার বিশেষ এমন কিছু নেই, সময় মত ধীরে সুস্থে একদিন শুনিয়ে দেওয়া যাবে।

৪১

রবিবার সকাল বেলা আটটার পূর্বেই চন্দ্রবাবু স্নান ও চা পান সারিয়া ঘরে বসিয়া ভাবিলেন—আজ কলিকাতার মেল জাহাজ সাড়ে নটায় পৌঁছিবার কথা, একবার হোয়ার্ফের দিকে বেড়িয়ে দেখে আসা যাক্ কত রকম যাত্রী কত মেল ব্যাগ নামছে। এই জিনিসটি দেখবার শখটুকু তাঁর পুরামাত্রায় ছিল।

নীচে রাস্তা থেকে পান্নালালের ডাক শোনা গেল—"চন্দর, ওহে চন্দর বাড়ী আছ?" তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়া চন্দ্র দেখিল পান্নু বাবু রাস্তার ধারে বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে। আর একখানি ডাইকের নূতন "ব্রাউনবেরী" থেকে এক প্রৌঢ় বয়স্ক বাঙালী ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নামিতেছেন। চন্দ্র ডাকিল উপরে এস, কিন্তু পান্নাবাবু ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নীচে আসিতে বলায় তিনি তখনি নীচে রাস্তায় নামিয়া আসিলেন।

ততক্ষণে ঐ ভদ্রলোকটি পান্নালালের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পান্নু তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—"বাবা"।

চন্দ্র সেইখানেই নত হইয়া প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি লইলেন।

—আরে থাক্ থাক্ চল বাপু তোমার ঘরে গিয়ে বসি, তোমার সংগে কথা কইতে একটু সময় লাগবে। এই বলিয়া পান্নুর বাবা প্রথমেই সিঁড়ির দিকে আগাইয়া চলিলেন।

পান্নুর বাবা শঙ্করলাল মিত্র, অতি সাদাসিদা বাঙালী পোষাক—মিলের ধুতির উপর একটি পাতলা ভায়লার সার্ট পরা, গলায় একখানি জাপানি সিল্ক চাদর জড়ান। গড়নটি ছিপছিপে প্রায় রোগার কাছাকাছি। কিন্তু হাতের মোটা ছড়িগাছটিকে দেখিয়া মনে হয়, তাতে ভারকেন্দ্রের সংহতি রক্ষা হইয়াছে। বয়স পঞ্চাশের উপর, গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল গৌর। মুখ ও চক্ষু দুইটি দেখিলে মনে হয়, লোকটি ধীর প্রকৃতির ও প্রতিভাবান পুরুষ।

চন্দ্র—অতীব বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিল,—এই শঙ্করলাল মিত্র এত বড় ইঞ্জিনীয়ার, বহু লক্ষ টাকার মালিক, এত সিম্পল সাদা সিদা লোক?

আর মিঃ মিত্রও নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া চন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন তাহার কৈশোর ও যৌবনের সাথী নীলকণ্ঠ রায়ের অবিকল

প্রতিমূর্তি। এই বয়সেই যে সেই বন্ধুর সহিত তাঁহার শেষ দেখা হইয়াছিল।

প্রথমে মিঃ মিত্র বলিতে লাগিলেন। কাল পানুর মুখে তোমার খবর পেয়ে আমি মাঝ রাত্রি পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীর কথা, আমাদের ছেলে বয়সের কথা নিয়ে মনে মনে কত কি আলোচনা করেছি। ইচ্ছা হল তখনই এসে তোমায় দেখি। তাই আজ প্রথমেই এখানে এসে গেলাম। তুমি বোধ হয় খুব আশ্চর্য হচ্ছ আমার কথা শুনে?

চন্দরবাবু—কোন উত্তর দিতে পারিলেন না কেবল মাত্র বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মিত্র মশাই বলিয়া চলিলেন—আগে আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমায় জানাই, না হলে তুমি আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না, বাবা। তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, প্রায় আটখানি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে যে লোকালিটী (জনপদ) তার মধ্যে তোমাদের পৈত্রিক বাসস্থান রামচন্দ্রপুর গ্রামটি প্রধান ও সমৃদ্ধ। রামচন্দ্র পুরের লাগাও তোমাদের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের রাস্তা বসন্তপুর আমার জন্ম স্থান। কিন্তু বাহিরের কাহাকেও পরিচয় দিতে গেলে আমরা ঐ রামচন্দ্রপুর সাকিন বলে থাকি।

তোমাদের পূজার বড় দুর্গাদালানে আমাদের গ্রাম্য পাঠশালা বসতো, আমরা আট গ্রামের ছোট ছেলেরা ঐখানে পড়তে যেতাম। ঐ পাঠশালা চালাতেন, সে সময়ে একজন দক্ষ গুরু মহাশয়।

তাঁর বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলা। সকলের নিকট তিনি মাধব গুরু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে একজন দক্ষ শিক্ষক বলতে আমি বাধ্য কারণ, সেই বয়সে তিনি আমায় যে নামতা ও শুভঙ্করী শিখিয়ে দিয়েছিলেন তা হায়ার ইঞ্জিনিয়ারিংএ আজও আমার কাজে লাগছে, এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এইবার তোমাদের বাড়ীর কথা বলি, তোমার বাবা নীলকণ্ঠ আমার পাঠশালার ও স্কুলের সহপাঠী। সকালে পাঠশালা বসে বেলা নটার সময় জল পানের ছুটী হতো। গুরু মশাই তখন নিজের সংসারের হাটবাজার করতে যেতেন। নীলু আমায় টেনে তোমাদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেত।

তোমার পিতামহী, আমার জ্যাঠাইমা সন্থ টাটকা দোয়া গরুর দুধে, গরম মুড়ি ভিজিয়ে নারকেল সন্দেশের সংগে একই পাত্র থেকে নিজে হাতে করে আমাদের দুজনেরই মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন।

পরে একটু ভাবাবেশের সহিত বলিতে লাগিলেন, তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না—এই কর্ম জীবনে প্রায় অদ্ধেকটা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালাম, কত জায়গায় কত সুখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে এলাম কিন্তু আমার ঐ জ্যাঠাইমার ফলারের মত অমৃতের স্বাদ আর কোথাও ত পেলাম না। সে ত কেবল মাত্র দুধে ভেজান নয় সে যে মাতৃস্নেহ ঘনামৃতে ভরপুর!

কার কথা বলছি তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ চন্দর, তোমার পিতামহী,—"দয়াময়ী" দেবী—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। এবারেও চন্দর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন অগ্রাণ মাসের এক জ্যোৎস্না রাত্রে একই লগ্নে তোমার বাবার ও আমার বিবাহ হয়।

তোমার পিতামহ আমার বাবাকে নিজের ভাইএর মত স্নেহ করতেন। দুর্গা পূজার সময় ও অন্য সমস্ত ক্রিয়া কর্মে আমাদের দুই পরিবারের মেয়ে পুরুষদের মধ্যে নিমন্ত্রণ ও আসা যাওয়া হ'তো। এই কারণে অতি অল্প বয়স হতেই তোমার মার সহিত পানুর মার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

৪২

আমি পুণা ইনজিনিয়ারিং কলেজ হতে গভরমেণ্ট বৃত্তি নিয়ে বিলাত যাই। স্কলারসিপের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরীক্ষা দিবার কথা ছিল আমি তা ভাল করেই পাস করতে পেরেছিলাম।

আমাদের প্রফেসার ডাঃ ব্রাউন আমায় বড় স্নেহ করতেন, তিনি আমায় পরামর্শ দিয়ে বললেন,—মিটরা, তুমি আর কিছুদিন এদেশে থেকে ফিজিক্সে, বিশেষ করে রিভার ট্রেনিং সাবজেক্ট নিয়ে ভাল করে রিসার্চ করে যাও।

ইণ্ডিয়ার প্রায় সকলকেই দেখি সিভিল বা মেকানিক্যাল্ ইনজিনিয়ারিং পাস করে যান, কৈ নদী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতে বড় কাকেও দেখি না। তোমাদের দেশ বড় বড় নদ নদীতে ভরা, দেশে যে জিনিসের আধিক্য থাকে সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকাই ত দরকার। তাতে অনেক সুবিধা ও সুযোগ পেতে পারা যায়, নয় কি?

হিসাব করে দেখলাম ঐ কাজ শেষ করতে আরও অন্ততঃ এক বৎসর সময় লাগবে। যদিও ভাল করেই জানতাম এর জন্য সমস্ত খরচ চালান আমার বাবার সাধ্যে কুলাবে না, কারণ তখন আমার বৃত্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তবুও এ বিষয় বিস্তারিত করে লিখেছিলাম আমার বাবাকে।

তিন সপ্তাহ পরে টমাস কুক্‌দের পত্রে জানতে পারলাম আমার হিসাবে তারা ২০০ দুশো পাউণ্ড জমা পেয়েছে আর ঐ টাকা তাদের কলিকাতা এজেন্সী আপিস পাঠিয়েছে।

এই টাকার বেশি ভাগ কোথা থেকে এসেছিল জান, এই টাকা কে দিয়েছিলেন জান, চন্দর? তোমার পিতামহ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ রায়।

এই প্রসঙ্গে আমার বাবা, রায় জ্যেঠা মশাইএর কথা যা লিখেছিলেন সেই পত্রখানি আজ পর্যন্ত ইষ্ট কবচের অধিক যত্ন করে আমি আমার ওয়ালেটে রেখে দিয়েছি। ইষ্ট মন্ত্রের মত যখনই সেটিকে বারবার আবৃত্তি করে থাকি, তখন জ্যেঠা মশাইএর উদার হৃদয়ের ও সহানুভূতির স্মৃতিতে আমার বুক ভরে ওঠে।

মিত্র সাহেবের মত অমন গম্ভীর প্রকৃতির লোকেরও ভাবের আবেশে স্বর ভারি ও কথা মন্থর হইয়া আসিল।

মিঃ মিত্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন— "দশ দিন পরে বাবার পত্র পেলাম, তিনি লিখেছেন—"তুমি পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাস করিয়াছ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তুমি আরও লিখিয়াছ যে ইহার ফলে তুমি একটি যে কোন্ রকম সাধারণ কর্ম লইয়া দেশে ফিরিতে পার।

তোমার প্রফেসার মহাশয়ের পরামর্শ মতে কিন্তু আরও কিছুদিন ওখানে থাকিয়া কায কর্ম ভাল করিয়া শিখিয়া আসিতে পারিলে, আরও ভাল ও বড় পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে। কোন্ বাপের না ইচ্ছা হয় যে এরূপ ক্ষেত্রে তার সন্তানকে অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার উন্নতির সহায়তা করে?

তুমি আমার আর্থিক অবস্থা সকলই জ্ঞাত আছ; তবে কি করিয়া যে তোমায় টাকা পাঠাইতে পারিয়াছি তাহা তোমায় জানাইয়া রাখা উচিত মনে করি।

কাল রাত্রে তোমার পরীক্ষায় পাসের খবর দিবার জন্য ও বর্তমান অবস্থায় কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্যও বটে, রামচন্দ্রপুরে বৈকুণ্ঠ দাদা মশাইএর নিকট যাই, কারণ অনেক সময় আমি তাঁর সুপরামর্শ ও সাহায্য পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকি।

দাদা তোমার পত্রখানি দু'তিন বার ভাল করিয়া পড়িবার পর

বলিলেন—চারু, আমার বাবার নাম চারুচন্দ্র মিত্র কি না,—"এর আবার পরামর্শ করবার কি আছে ভায়া, টাকা ত পাঠাতে হবে, ভাই।"

—আমি অতটা পেরে উঠ্‌বো কোথা থেকে দাদা, আমার অবস্থা ত আপনার অজানা নেই।

—পারতেই হবে ভায়া যেমন করেই হোক। এরপর দেরাজ খুলে কি যেন বার করে—সম্ভবতঃ চাবির রিং নিয়ে অন্দর মহলের দিকে উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, চারু আসছি একটু বস।

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে আমার হাতে দুখানি হাজার টাকার নম্বরী লোট,—"তখনকার কালে আমাদের পল্লীগ্রামের ভাষায় নোটকে লোট বলা হতো, আমার হাতে দিয়ে বললেন এতে কুলিয়ে যাবে বোধ হয়, কি বল চারুচন্দ্র ?

বিস্ময় বিহ্বল আমি কেবল মাত্র বলিতে পারিলাম "দাদা" আর কথা যোগাইল না, আমার।

কিছু সময় দিয়া তিনি অতি সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন কি হল চারুচন্দ্র, কি বলছিলে ? এখন আর কোন কথা নয়, কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিও। সঙ্কুলান না হলে আমায় জানাতে যেন লজ্জা বোধ করো না। আহা ! ছেলেটা আশা পথ চেয়ে বিদেশে অপেক্ষা করছে !

—দাদা একটা রসিদ কি হ্যাণ্ডনোট ?

দাদা হাসিয়া বলিলেন—শোন চারুচন্দ্র, ভাইকে বিশেষ করে ভাইএর ছেলের লেখাপড়ার সাহায্যের জন্যে বৈকুণ্ঠ রায় টাকা কর্জ দেয় না, তোমায় ত টাকা দিলাম না, দিলাম শংকুকে, বাপ ব্যাটার মধ্যে তেজারতি চালাতে চাও না কি তুমি ?

এটা পরিশোধ করবার কু-মতলব যেন কখনও করো না, তা বলে রাখছি। আহা ছেলেটা হীরের টুকরো, বেঁচে থাক ! বেঁচে থাক !

—ওঠো চারুচন্দ্র রাত অনেক হলো যে, পরে তাঁর প্রধান পাইক মধু সর্দারকে ডেকে হুকুম দিলেন যা, চারুবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়, মধো।

বিলাত থেকে চাকরি নিয়ে একেবারে মাদ্রাজের গোদাবরী ডিভিসনে পোষ্ট হয়ে দেশে ফিরলাম। সবে মাত্র চারমাস চাকরিতে আছি, খবর পেলাম বাবা মারা গেছেন, পুণা কলেজে পড়ার সময় আমি মাতৃহীন হই।

—দেশে আমার বিলাত যাওয়া নিয়ে বিষম দলাদলির সৃষ্টি হয়ে উঠলো। সামাজিক শাসন তখনকার দিনে বেশ কড়া রকম ছিল এবং সকলকেই তা মেনে চলতে হতো।

আমাকে নিয়েই ত যত গোল, তাই আমি বুদ্ধিমানের মত সে সব গোলযোগ হতে দূরে থাকলাম, আর বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের মত কর্ম্মস্থল গোদাবরী তীরে পিতৃতর্পণ শ্রাদ্ধাদি শেষ করলাম।

সেই সময় হতে আর আমাদের পল্লিসমাজে স্থান হল না। চাকরি উপলক্ষে সারা জীবনটা বাইরে বাইরেই কাটল. গ্রামের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় নি।

কাল রাত্রে পানুর মুখে শোনার আগে তোমাদের সংসারের এরূপ ভীষণ অবস্থা বিপর্যয়ের বিষয় কিছুই জানতাম না, উঃ কি দারুণ পরিবর্তন !

মিত্র মহাশয়ের এই অকপট বিবৃতি শুনিয়া, তাঁহার এই সরল ও উদার অন্তকরণের পরিচয় পাইয়া চন্দ্রবাবু একান্ত মুগ্ধ হইলেও মনের কোন নিভৃত কক্ষে অবিশ্বাসের কণ্টক যন্ত্রণা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

যে বাল্যকাল হইতে একের পর একের নিকট হইতে প্রতারণা পাইয়া আসিয়াছে ; বিশ্বাসঘাতকতার বিষের জ্বালা যার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত

হইয়া আছে, সে কি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায়, না, পারে ?

চন্দ্র ভাবিতেছিলেন—ঠাকুর্দা মশায়ের কি কিছুমাত্র, ইকনমিক্স জ্ঞান থাকতে নাই, আবার দেশের লোককে বড় হতে সাহায্য করে আমার আরও একজন শত্রু বাড়িয়ে গিয়েছেন। উপকারের বদলে মানুষ চিরদিন ত অপকারই পেয়ে আসছে। পুঁথিগত অর্থনীতি কি বলে জানি না কিন্তু আমার অদৃষ্টে সনাতন ইকনমিক্স অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে—উপকারের উচিত মূল্য হচ্ছে প্রত্যুপকার নয় অপকার, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা আরও এমনি কত কি !

আবার কি প্রাণকৃষ্ণ কাকার, আবার কি নিতাই বসাকের পুনরাভিনয় না কি ? এখনও কি আমার দুষ্ট গ্রহ শান্ত হন নি ? ভগবান রক্ষাকর্ত্তা !

কিন্তু কেন, মনটাকে তেমন চড়া পর্দায় তুলে রাখতে পারছি না আজ, কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে কড়ী কোমল মিটে পর্দায় নামিয়ে আনছে ?

চন্দ্রকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া মিঃ মিত্র বলিলেন, যাক্ এখন আর কথা নয়, আর বেশি দেরি হলে তোমার কাকীমা রাগ করবেন। তাঁর হুকুম ছিল যত শীঘ্র সম্ভব তোমায় ও বাড়িতে নিয়ে যেতে, তবে তোমাকে পরিচয়ের জন্য একটু প্রস্তুত করে নিয়ে যাওয়াই আমি উচিত বোধ করলাম। এখন চল তোমার কাকীমাক দেখা দিয়ে আসবে, বাবা।

পানুবাবু রামলালকে হাঁক দিয়া বলিলেন—আজ তোমার বাবু এ বাড়ীতে খাবেন না। এ বেলাও না রাত্রেও না বুঝেছ, দরজা বন্ধ করে লম্বা ঘুম দাও।

ছোকরাদের এই ব্যবস্থা শুনিয়া মিত্র মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—না না রামলাল, তুমিও আমাদের সংগে চল তোমাকেও ও বাড়িতে

খেতে হবে, আর আমাদের ঠিকানাটাও ত তোমার চিনে রাখা দরকার। এখন থেকে তোমায় সময় সময় ওবাড়ীতে যাওয়া আসা করতে হবে ত?

মিঃ মিত্রের সুব্যবস্থায় চন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সে মুখভাব সরল ও দৃষ্টি অকপট।

৪৩

ঘোড়-দৌড়ের মাঠ পার হইয়া ইয়র্ক (York) রোডে মিত্তির সাহেবের প্রকাণ্ড হাতা ওয়ালা বাংলা। বাহির মহল ইংরাজি ষ্টাইলে সাজান কিন্তু অন্দর মহল পুরাপুরি হিন্দু বাঙালির গৃহস্থালী।

উঠানে তুলসী মঞ্চে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ দিয়া প্রণাম করা হয়। লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা ও ইতু পূজাতে পর্যন্ত স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে নিয়মিত পূজা পাঠান হইয়া থাকে। ফয়জাবাদি ভগবতী চৌবের উপর রান্নার ভার।

সদর মহলেও একটা রান্নার ব্যবস্থা আছে তবে তার ব্যবহার প্রতি-দিনের জন্য নয়, কোন বিশিষ্ট অতিথির আগমনে বা পর্ব উপলক্ষে কাজে আসে আর সেখানে কাহার দ্বারা বা কি প্রথায় রন্ধন কার্য হয় তাহা আমাদের জানা নাই।

মিত্র সাহেবের প্রথম দুই কন্যার বিবাহ তিনি অল্প বয়সেই দিয়া-ছিলেন কিন্তু আজকাল সামাজিক হাওয়া একটু পশ্চিমের দিকে ঘুরিয়া পড়ায় ছোট মেয়ে সুষমার বয়স সতের পার হইলেও আজ পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় নাই। সুষমা দাদা ও দিদিদের 'সুসী' চাকর ঠাকুররা 'সুসীবাবা' আর মা ও বাবার তিনি বড়ই আদরের কন্যা 'বুড়া মা'।

ইনি মিত্র মহাশয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যা, প্রকৃতই মেয়েটি সুন্দরী

যেন এক গাছি যুঁই ফুলের গড়ে মালা। বাপের মত মসৃণ সাদা রং ও ছিপছিপে গড়ন, আয়ত উজ্জ্বল বড় সুন্দর চোথ দুটি।

প্রথম হইতেই কন্‌ভেন্ট্‌ স্কুলে বিলাতি টীচারদের নিকট শিক্ষা প্রাপ্তা হইলেও, মাতা ও পারিবারিক আদর্শে বুড়া ততদূর মেম সাহেব বনিয়া যাইতে পারেন নাই। গত বৎসর হইতে স্কুল ফাইনাল্‌ পরীক্ষার পর তার স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত মশাই প্রতিদিন বাংলা পড়াইয়া যান কারণ সাহেবি স্কুলে তার বাংলা পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

বুড়া এখন বাড়িতে মার পার্‌সোন্যাল এসিস্‌টেন্ট বা তাঁহার সকল কাজের সাহায্য কারিণী। শঙ্করবাবুর সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান রঙ্গলাল কলেজিয়েট্‌ স্কুলের ছাত্র।

৪৪

আজ আট দিনের পর চন্দ্রবাবু কৃপারাম শেঠের গদিতে হাজিরা দিলেন। কৃপারাম হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এত কথা মাজা করে কি ঠিক করলেন, মিঃ রয়?

—আমি কথা মাজা করেছি সে কথা আপনাকে কে বলল?

—বাঃ আপনি নিজেই ত এই মাত্র বলছেন। ছিঃ, এই সে দিন মাত্র আমায় গুরু বলে স্বীকার করে গেলেন, জানেন না সকল ধর্মেই বলে যে গুরুর নিকট কিছু গোপন করতে নাই।

—আপনাকে সকল কথা জানাব বলেই ত এখানে এলাম। আমি যে কাজেই হাত দিই না কেন, সমস্তই আপনার অনুমতি, পরামর্শ ও সাহায্য সাপেক্ষ। আপনার আশির্বাদ না পেলে কোন চেষ্টাই যে আমার সফল হবে না এতটুকু বোঝবার শক্তি আমার হয়েছে বোধ হয়।

—কাযটা কি ঠিক করেছেন বলে ফেলুন।

—"জমি কেনা বেচা", কারণ জমির উপসত্ব ভোগ ও সুবিধা মত জমি ও জমিদারি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের বংশগত জীবিকা। আরও যখন এখানে প্রথমেই ঐ ল্যাণ্ড স্পেকুলেশনে কিছু লভ্য করতে পেরেছি তখন মনে হয় এটা ভগবানের ইঙ্গিত যে আমি ঐ ব্যবসাটাই নিয়মিতভাবে ও মনযোগ দিয়ে করি।

—অনেকক্ষণ চিন্তার পর শেঠজী বলিলেন—টাইমলি হিট্, সময়োচিত প্রস্তাব বটে তাতে সন্দেহ নাই। মনে হয় বর্তমানে ঐ কাজটি কিছু দিন বেশ জোর চলতে পারে। সত্য বলতে কি এইটি আমাকে একেবারেই ষ্ট্রাইক করে নি। থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রয়! আপনার এই সাজেসনটা মূল্যবান, সহজে ছাড়া হবে না। আজ সোমবার আগামী শনিবার রাত্রে আমি এ বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করব কারণ ইতিমধ্যে এই কাযের জন্য আমার এক বন্ধুর পরামর্শ লওয়া আমি আবশ্যক মনে করি, এ শহরে এই লাইনে তাঁর মত অভিজ্ঞ লোক আর দ্বিতীয় পাবেন না, মিঃ রয়।

এখন ত দুই মাসের জন্য চিফ কোর্ট বন্ধ আপনার আদালতের কাজ নাই, আমি ইচ্ছাকরি আপনিও এই অবসরে আরও একটু ভেবে দেখুন ও সন্ধান নিতে চেষ্টা করুন।

এই সময় মিঃ মিত্রের কথা একবার চন্দ্রবাবুর মনে হইল, তাঁর পরামর্শ লওয়া যায় না কি? আচ্ছা বিষয়টা আরও একটু অগ্রসর হ'ক তখন দেখা যাবে।

৪৫

মিত্র সাহেবের বাটীর সদরের চওড়া বারান্দায় বৈকালিক চা পানাদি শেষ হইয়াছে। চন্দ্র ও পানু তখনও টেবিলের সামনে বসিয়া ইকনমিক্স ও পলিটিক্স লইয়া ঘোর তর্ক চালাইতেছেন।

মিঃ মিত্র সামনের বাগানের হাতার মধ্যে ধীরে ধীরে পাদচারনা করিতেছিলেন, তার পশ্চাতে মালী, তাহাকে তিনি গাছপালা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কিছু হুকুম দিতে ছিলেন।

গুলদার বর্মা পনির জুড়ীযুক্ত একখানি খোলা ফিটন ফটকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল একচক্ষু শেঠজী কৃপারাম গাড়ী হইতে নামিতেছেন। মিঃ মিত্র আগাইয়া গিয়া করমর্দনান্তে সংবর্ধনা করিয়া তাঁহাকে আনিয়া আপিস ঘরে বসাইলেন।

ঘরে ঢুকিবার সময় শেঠজী চন্দ্রকে বারান্দায় ওরূপ আত্মীয়ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শের পর দুই বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইলেন। বিদায় লইবার সময় ঈষৎ হাস্য সহকারে শেঠজী চন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—কাল আমার গদিতে আসবার সময় করতে পারবে কি রাত্রি আটটার পর?

—নিশ্চয় পারব স্যর।

শেঠজী বিদায় হইলে মিঃ মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—চন্দর তুমি কানা কৃপারামকে জোটালে কি করে? আমাদের দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব উপকুল বাংলায় আর ওরা হল পশ্চিমে সিন্ধের অধিবাসী। দেড় হাজার মাইল তফাৎ।

—বড় অসময়েই ওঁকে আমি পেয়েছিলাম, কাকাবাবু। যথেষ্ট উপকার ও শিক্ষা অযাচিত ভাবে পেয়েছি আমি ওঁর কাছ থেকে।

—দেখ চন্দর, আমি যে কথা এতদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, সেটি আজ কৃপারামবাবু আমায় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তোমার স্বভাব চরিত্র, তোমার কর্মশক্তি ও সততা সম্বন্ধে ওঁর খুব উচ্চ ধারণা। লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও খাঁটী মানুষ। দেখলাম তোমায় উনি বেশ ভাল করেই স্টাডী করেছেন। ওরূপ একটি পাকা বিজ্‌নেস্ ম্যানের নিঃস্বার্থ মতামতের অনেক দাম আছে। শুনে আমি অত্যন্ত খুসি হয়েছি। আশির্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবি হও, তোমার বংশের নাম উজ্জল কর।

এখন কাজের কথা শোন—তুমি শুনলাম কৃপারামকে বলেছ যে তুমি জমি খরিদ বিক্রির কাজ আরম্ভ করতে চাও, অর্থাৎ গভরমেণ্ট অক্‌সানে জমি কিনে পরে বেশি দরে বেচে তা থেকে কিছু লাভ পাওয়া। কিম্বা কোন লোককে জমি কিনিয়ে দিয়ে বা কাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে দিয়ে তার দালালি লাভ করা, কেমন?

—আজ্ঞে হাঁ সেইরূপ প্রস্তাব আমি করেছি বটে।

—আমি বলি ওকাজে কোন রকমে ডাল ভাত চলতে পারে কিন্তু উন্নতির প্রসপেক্ট বিশেষ কিছু নাই। এই সম্বন্ধেই এমন কিছু করা যেতে পারে যাতে পেটভরা খোরাক পাওয়া সম্ভব।

উপযুক্ত লোক অভাবে, ইচ্ছা থাকলেও, যে কাজ আমি এতদিন হাতে নিতে পারিনি, এখন তোমাকে দিয়ে যদি সেইটি আরম্ভ করাতে পারি আর তাতে যদি তোমার বর্ত্তমান অবস্থার কিছু উন্নতি হয় তবে হয়ত স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ রায়ের বংশের ঋণ আমার কণামাত্র পরিশোধ হতে পারে, চন্দর।

এই মাত্র আজ কৃপারাম বাবুর সহিত আলোচনা করে আমরা

স্থির করেছি যে,—গবরমেণ্ট ও পোর্টট্রাষ্টের কাছ থেকে সুবিধামত আন্‌ডেভেলাপ্‌ড জমি বন্দবস্ত করে নিয়ে আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী ঐ জমির আবশ্যক মত উন্নতি করবার পর প্লট্‌ করে, আমরাই সাধারণকে বিক্রি করব। আর এর সঙ্গে সরকারি নিলামী জমি ও কেনা বেচা চলতে পারবে এবং এই সংক্রান্ত অনেক রকম কাজ আমরা নিতে পারব। সে সকলের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা আমার মাথায় আছে তাকে কার্যকরী করতে আমার অধিক সময় লাগবে না বোধ হয়। ক্রমে আমি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দেবো।

৪৬

ক্রমান্বয়ে পরবর্তী তিন রবিবারে তিনটি মিটিং হইবার পর মোটামুটি স্থিরীকৃত হইল যে :—

(১) কৃপারাম শেঠ ও মিঃ শঙ্করদাস মিত্র এই যৌথ কারবারে ক্যাপিট্যাল স্বরূপ যে টাকা ফেলিবেন, তাঁহারা ঐ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা হিসাবে সুদ পাইবেন।

(২) মিঃ চন্দ্রকান্ত রায় (ম্যানেজিং ডাইরেক্টার) আপিস খরচ কারণ মাসিক পাঁচশত ও নিজ ব্যক্তিগত খরচ কারণ আরও পাঁচ শত টাকা পাইবেন।

(৩) ১ম ও ২য় দফায় লিখিত খরচ বাদে লাভের টাকার দশম অংশ রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হইবে। বক্রি টাকা অংশীদারদের মধ্যে সমানাংশে বিভক্ত হইবে।

ক্রমাগত তিনমাস উকিলের আপিসে, আদালতে ও অন্য অনেক স্থানে যাতায়াত, অনেক পরামর্শ ও আলোচনার পর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্নিমার শুভদিনে প্রকাশ্য ভাবে কারবারের উদ্বোধন করা হইল।

ঐ দিনে রেঙ্গুণের প্রধান তিনখানি কাগজে "রেঙ্গুণ গেজেট," "রেঙ্গুণ টাইম" ও "বি বি এড্‌ভাটাইজারে" নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

THE BURMA LAND DEVELOPMENT
CORPORATION, LTD.,

(Registered Under Companies Act)

Directors—

Sankar Lall Mitra Esq.—Consulting Engineer
York Road, Rangoon.

Seth Kriparam Ahuja—Merchant, Banker
Sule Pagoda Road, Rangoon.

Chandra Kanta Roy Esq.,—Managing Agent
Bar Street, Rangoon.

REGISTERED OFFICF
Spark Street, Rangoon.

কর্পোরেশন অফিস স্থাপিত হইবার প্রথম হইতেই আশাতীত কাজ আসিতে লাগিল। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার লইয়া চন্দ্রবাবুকে প্রথমে প্রভূত বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু এই নূতন কাজের শৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধন তাহার দিবা চিন্তা ও নিশা স্বপ্নের অধিকাংশ স্থানটিই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

যুবক চন্দ্রকান্তের অমানুষিক পরিশ্রম, অসীম উৎসাহ, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দেখিয়া তাহার partner-patrons অংশীদার পৃষ্ঠপোষকেরা —মিঃ মিত্র ও শেঠজী অতি উৎসাহ সহকারে চন্দ্রবাবুকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য মা কমলার দৃঢ়ব্রত সাধক উদ্যোগী পুরুষ চন্দ্রকান্ত এইরূপে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি অতি সত্বরেই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্রমে ঐ দেবীর আশীর্বাদ ঘনীভূত হইয়া রায়মহাশয়ের ব্যাঙ্কব্যালান্স ধীরে ধীরে ভারি করিতে লাগিল এবং তাঁহার সাধনা সিদ্ধির পথ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল।

৪৭

শঙ্করলাল বাবুর ছোট মেয়ে সুষমা অতি ধীর ও শান্তস্বভাব, সকল রকম সাংসারিক কাজে নিপুণা, চলিত কথায় যাহাকে বলে মার ডান হাত। যে কাজটি সে করে তাহা অতি যত্নের সহিত ও সুচারুরূপে করিয়া থাকে।

গত কয়েকদিন সুষমার মাতা মেয়েকে যেন একটু অন্যমনা বোধ করিতেছেন। কাল রাত্রে একটি দামী জিনিস তার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাতা আজ তাঁর বুড়াকে সামনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁরে বুড়া, তোর শরীরটা কি এখন ভাল যাচ্ছে না, চারদিকে যে, অসুখ বিসুক চলেছে দেখে ত একটুতে ভয় লাগে, বাপু।

—না আমার ত কোন অসুখ হয় নি, মা।

এই উত্তরে কিন্তু মার মন প্রবোধ মানিল না তিনি একটি চাপা নিশ্বাসের সহিত মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন,—এখনকার কি ঢং হয়েছে, মেয়ে আরও ধাড়ী হোক, তবে বিয়ে দেওয়া হবে হুঁ:, আমাদের এই বয়েসে একটা বিয়ান হয়ে গিয়েছিল। কর্ত্তার ত কোন চাড় দেখছি না, আগের মেয়েদের ত অল্প বয়েসেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কি যে হাওয়া ফিরল—দূর, ছাই ছাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র পানু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওপর দিকে চেয়ে অমন করে কি ভাবছ মা ?

—এই তোমাদের কথাই ভাবচি,—বিয়ে থা করবার নামটি নেই, কি ফ্যাসানই বার করেছ, ধন্যি ছেলে তোমরা বাবা।

—আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করব বলেছি ত তোমায় মা।

—তা বই কি। তারপর সেখানকার একটা সাদা ম্যাথরের মেয়ে ঘাড়ে করে ফিরবে আর কি ? সেটি হচ্চে না বাছা, তা বলে রাখছি এখন থেকেই।

আগে বৌ আনি তোমায় বেঁধে ফেলি তখন যেখানে ইচ্ছা যেও। তা ছাড়া আমি একলাই বা তোমাদের এত বড় সংসার চালাব কেমন করে বল ?

পাশে বুড়াকে দেখাইয়া, মৃদু হাস্যে ব্যাঙ্গোক্তি ছলে পানুবাবু বলিলেন —কেন তোমার ঐ সব্যসাচী পারসোনাল এসিট্যাস্ট্যান্টটি রয়েছে ত ?

—ও বুঝি চিরকাল তোমাদের সংসারে থাকবে পরে উদাসক্লিষ্ট স্বরে মা বলিলেন মেয়ে যে পরের সংসার করবার জন্যে জন্মায় তা জান না। হাঁরে পানু তোকে জিজ্ঞাসা করতে একেবারে ভুলে গেছি—চন্দর কেমন আছে রে, তার কোন খপর নিয়ে ছিলি কি ?

কাজের মাঠে একটা নালা ডিঙাইবার সময় চন্দ্রবাবুর হাঁটুতে চোট লাগাতে তিনি প্রায় এক সপ্তাহ উত্থানশক্তি হীন।

পানুবাবু বলিলেন—সে ভালই আছে মা, আমি ত তাকে রোজ দেখতে যাই। ডাক্তার ম্যাসেনি কাল তার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়েছেন কিন্তু বলে গেছেন সে যেন আরও কিছুদিন চলা ফেরা না করে আর একটা মালিস দিয়েছে, দুবার করে তাই দিয়ে মাসাজ করতে।

স্নেহ গদ গদ কণ্ঠে মা বলিলেন—ও যে কত আদরের ছেলে রে পান্নু আজ বিদেশে নিবান্দা (নির্বান্ধব) পুরীতে অসুখ হয়ে পড়ে রয়েছে আহা চামেলীর কি বরাৎ—অমন শ্বশুরবাড়ী, অমন সোয়ামী, অমন সোনার চাঁদের মত প্রথম ছেলেটি কিছুই ভোগে এল না রে! আমি চন্দরের মার কথা বলছি।

পান্নু। চন্দর ত বলেছিল এ দেশে আসবার আগে সে মাকে তার মাসিমার কাছে রেখে এসেছে, কাশীতে।

বুড়া জিজ্ঞাসা করিল—চন্দরদার মার নাম কি মা, "চামেলী?"

—না রে তার আসল নাম ওটা নয়। ওটা আমাদের মধ্যে পাতান নাম। হয়েছিল কি জানিস, তখন আমাদের খুব কম বয়স, রায়েদের বাড়ি যাত্রা, আমরা বারান্দার চিকের আড়ালে বসে যাত্রা গান শুনছি আর নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি গল্প চালিয়ে চলেছি। আমি চন্দরের মাকে দিদি বলে প্রথম ডাকতেই সে বললে—বা রে তুমি আমায় দিদি বলবে কেন ভাই, আমরা ত দুজনে এক বয়সী।

—তবে কি হবে? তখনকার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে বৌদের নাম জাহির হওয়াটা খুব লজ্জার কথা ছিল কি না।

তখন চন্দরের মা বল্লে—এস আমরা নিজেদের মধ্যে একটি ফুলের নাম পাতিয়ে নিই। আমি বললাম ভাই তোমার মতন সোন্দর মেয়ের সঙ্গে একটা সাদা ফুলের নাম পাতান চাই, তখন সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট কুচকে বললে—তুমিই বা কি কম সোন্দর গো। তারপর আমরা "চামেলি" ফুলের নাম পাতালাম আর কি। আহা মনে হচ্ছে সে যেন এই সেদিনের কথা, তার পর কিন্তু কত বছর কেটে গেল।

পান্নু বলিল—আমি অসুখের সময় তাকে আমাদের বাড়ীতে এসে থাকবার জন্যে অনেক বলেছিলুম, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না। কি বললে জান, বললে—ভাই পান্নু মা বোনেদের আদর ও সেবা পেলে

আমি নরম হয়ে যাব, আমার আর ঝাঁজ থাকবে না, ঐ ঝাঁজটুকুর জোরেই চন্দর আজও বেঁচে আছে, ভাই।”

—এসব হেঁয়ালি বুঝতে পারি না বাপু, আমরা হলুম সেকেলে মানুষ। বুড়া জিজ্ঞাসা করিল—চন্দরদাকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত নয় কি মা?

—খুবই উচিত, আমি সময় করে উঠতে পারচি কই? বুড়া তুই কেন পান্নুর সঙ্গে আজই একবার তাকে দেখে আয় না?

৪৮

চন্দ্রবাবু সমস্ত দিন নানা কার্যে নিরত থাকিয়া প্রায় মধ্য রাত্রে ক্লান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করা মাত্র গাঢ় নিদ্রায় তাঁর রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু আজ এক সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হইতে পারেন নাই, নিদ্রার অভাব, তাই শয়ন করিয়া অনেক পুরাতন কথা তাঁর মনে উদয় হইত্বেছে—কতদিন, কতদিন, প্রায় চার বৎসর চলিয়া গেল ইতিমধ্যে একমাত্র মা ছাড়া আর কোন আত্মীয়ের খবর তিনি রাখেন নাই।

বর্তমানে অর্থাভাব অর্থচিন্তা পরিমানে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যত উন্নতির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া আসিতেছে, তাই চন্দ্রবাবুর সরল ও স্বাভাবিক কোমল হৃদয়ের সুকুমার তারগুলিতে আবার ললিত ঝঙ্কারের সাড়া-পাওয়া যাইতেছে। অর্থচিন্তা ও কর্মচিন্তার ঝাঁজে এত দিন যাহা চাপা ছিল তাহা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতেছে।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া চন্দ্রবাবু আজ একখানি ক্যাম্প চেয়ারে শুইয়া ঐ সমস্ত পূর্বকথা ভাবিতেছেন। এক এক সময় তাঁর চক্ষুদুটি সজল ও নিশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিতেছে, পরক্ষণেই আবার নিজের আরব্ধ কার্যের চিন্তা তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছে।

দরজায় টোকার শব্দ, বার্তা আসিল—ভিতরে আসতে পারি কি ?

—কবে থেকে অনুমতি নিয়ে আমার ঘরে ঢোকা অভ্যাস করলে হে পানু বাবু ?

পানু বাবু উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিলেন—আরে সঙ্গে যে একটি বিশিষ্ট ভদ্র মহিলা রয়েছেন।

—কবে থেকে এই অভদ্রের আস্তানায় ভদ্রলোকদের আসা যাওয়া আরম্ভ হলো ?

—এই বোধ হয় প্রথম।

ততক্ষণে সুষমা ঘুরিয়া আসিয়া চন্দ্রবাবুর সামনে হাজির হইয়াছে। চন্দরবাবু সুষিকে আদর করিয়া স্বসা বলিয়া ডাকিতেন, তাহা শুনিয়া তার দাদাও এই বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অবশ্য আণ্ডার ষ্ট্রং প্রটেষ্ট্।

—কেমন আছেন চন্দ্রদা ?

—ওঃ স্বসা যে কি মনে করে।

—আপনাকে দেখতে এলাম।

—ধন্যবাদ, আমার ঐ বিছানাটাতেই বসো,—রামলাল।

সুষমা একটু মনমুগ্ধকর মধুর হাসির রক্তরাগ মুখে ফুটাইয়া সলজ্জ ভাবে বলিল—থাক আর রামলালকে ডাকতে হবে না,. আমি ওঘর থেকে চেয়ার আনছি। তাহার মুখে এই গোলাপী আভা ও সলজ্জ ভাব চন্দ্রবাবুর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। এই মধুর চাহনিটি চন্দ্রকান্তর বুভুক্ষ প্রাণে বেশ একটু মিষ্ট বাতাসের দোল দিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সচকিত ও ভীত চন্দ্রকান্ত ভাবিলেন—এ আবার কি বিপদ। এযে ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ, ঈশান কোনে কালো মেঘের উদয়, অঙ্কুরে পরিষ্কার না হইলে সমস্ত আকাশ ছাইয়া যাইবে। পদ্মায় ঝড় উঠিবে, তখন কে নৌকা সামলাইবে ? ভগবান আমায় বল দাও, পথ দেখাইয়া দাও।

চন্দকান্তের প্রার্থনা বিফল হইল না। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার প্রাণে দৈববাণীর ন্যায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল—

—"তুমি বিবাহিত", "তুমি রায়বংশের সন্তান!"

সুষমা রামলালকে দিয়া দু'খানি চেয়ার আনাইয়া তাহার একখানি অধিকার করিয়া বসিল। চন্দ্রবাবু রামলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পানুবাবু কোথায় গেলেন?

—তিনি ঐ সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর বর্মা-সাহেবের সাথে আলাপ করছেন, বাবু।

চন্দ্রবাবু মিনতির সুরে বলিলেন দেখ স্বসা, তোমায় দেখলেই আমার মনে হয়—জন্মজন্মান্তর হতে তুমি আমার বোনটি, এ জন্মেও তুমি তাই যেন থাকো ভাই।

—কেন এমন করে আজ আমায় একথা বলছেন চন্দ্রদা?

—আমার যে বোন নেই, এ জন্মে আমার মা আমায় একটি ভগ্নী দেবার সময় পান নি, তাইত এতদিন পরে কাকীমার কাছ থেকে তোমার মত একটি ভগ্নী পেলাম ভাই।

—চন্দরদা এখনও কি আপনার শরীর ভাল সারে নি, কেন এমন করে আবার আমায় এই সব কথা বলছেন? বিস্মিত সুষমা চন্দ্রবাবুর এইরূপ দুর্বল মনোভাব ইতিপূর্বে আর কোনদিন দেখে নাই।

—আমি বেশ সেরে গেছি, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলবার জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি! তোমাকে এখনই বলা আমার একান্ত উচিত হয়ে পড়েছে, যে—"**আমি বিবাহিত**"

সুষমার আরক্তিম গণ্ডে ক্ষণিকের জন্য একটি সাদা ছায়া পড়িয়া অল্প সময় মধ্যে মিলাইয়া গেল। সে শিক্ষিতা মেয়ে, মনোভাব চাপা দিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট পরিমানে আছে। সুষমা অতিশয় আশ্চর্য হইয়া কম্পিত স্বরে বলিয়া ফেলিল—সত্যি, স…ত্যি নাকি চন্দর দা, বৌদি কোথায়?

—সত্য বইকি ভাই। দেখছ না মাথার উপর আমার ইষ্টগুরু ঠাকুরের ছবি—চেয়ে দেখ ঐ সহাস্য কল্পতরু মূর্তি, তাঁর দক্ষিণ হাত তুলে আমায় বার বার আদেশ করছেন—তোমার কাছে এই কথা প্রকাশ করতে যে, আমি বিবাহিত! চাও, চাও তুমিও ঠাকুরের মুখ পানে চাও, সব মেঘ কেটে যাবে, ভুলে যাবে সব গ্লানি, হয়ে যাবে সব সহজ!

বিস্ময়াবিভূত সুষমা বলিল—চন্দরদা আপনি ত আর কাকেও একথা এতদিন বলেন নি।

—বলিনি বটে, বলবার ত কোন দরকার হয়নি এতদিন। আজ তোমার কাছে এই কথাটি বলবার বিশেষ জরুরি আবশ্যক হয়ে পড়লো যে ভাই, সুষমা! ইংরাজি উপন্যাস পড়ায় অভ্যস্ত মেয়ে সুষমা ইহার গূঢ় অর্থ সহজেই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল। লজ্জায় রক্তকমলাভ মুখখানি নত করিয়া প্রসঙ্গ ফিরাইবার জন্য সুষমা বলিল—সুষমাকে বাড়ির সকলে করলে সুষী, বিলাতি সুষীকে স্বদেশী ছাপ দিতে গিয়ে আপনি করলেন স্বসা তবে এখন আবার সুষমা কি জন্যে?

—পণ্ডিত মশাইএর কাছে বাংলা পড়ে এই বুঝি শেষে বিদ্যা হলো তোমার? তুমি আমার ভগ্নী তাই বলেই ত ডাকি আমি তোমায়, "স্বসা" —মানে বোন, ভগ্নী, বহীন্, যেমন মাতৃস্বসা মায়ের ভগীনি মাসী, পিতৃ-স্বসা—পিসী ইত্যাদি ইত্যাদি, বুঝলে?

আপনার বহীন বলে আমি নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যবতী মনে করছি দাদা, আপনি সাধারণ মানুষ নন, আপনি দে—

—তবে কি ভূত্?

—না না, আপনি ভূত্ হতে যাবেন কেন, আপনি চন্দ্রকান্ত ভূতনাথ, একটু পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিন, দাদা।

হাসিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন—পায়ে মোজা আঁটা তার ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, পায়ের ধুলা পাব কোথায় দিদিভাই? আমি কায়মনোবাক্যে

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি তোমায় চির সৌভাগবতী ও কল্যাণী করুন!

—হাঁ দাদা, আমার প্রশ্নটা যে এড়িয়ে গেলেন, কৈ বললেন না ত বৌদি কোথায়?

—বম্বেতে তাঁর বাপের বাড়ীতে আছেন। আজ এই পর্যন্ত শীঘ্রই সব কথা জানতে পারবে। আঃ, পানুটা কি চেঁচাতেই পারে, পানুবাবুর প্রবেশ, কোথায় এতক্ষণ অন্তর্ধান হ'য়েছিলে, বন্ধু?

—আর ভাই মংজী ব্যাটা ধরে ছিল, ছিনে জোঁক সহজে ছাড়ান পাওয়া—

—রাখ তোমার বার্মিজ বন্ধুদের কথা।

—আয়রে স্বসা আজ ওঠা যাক্ বলিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া পানুবাবু চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে আমাদের ওদিকে আসছ কবে? সুষমা বলিল মা ব'লে দিয়েছেন,—আপনি উঠতে পারলেই তাঁকে যেন দেখা দিয়ে আসেন।

—আরে আমি ত উঠতে পেরেছি, আর বেরবার জন্য ছটফট্ করছি, তোমরাই ত পাঁচ জনে মিলে আমায় বেরুতে দিচ্ছ না।

নিকটে রামলালকে পাইয়া পানুবাবু হুঙ্কার দিয়া তাহাকে বলিলেন শোনো রামলাল কাল বিকালে বাবুর খাবার করবে না, বুঝেচ, ডাক্তার সাহেব বাবুকে রাত্রে কিছু খেতে বারণ করে দিয়েছেন, শুনেছ বোধ হয়। হাসির হল্লা উঠিল।

৪৯

আপিসের একটি প্রশস্ত হলে, প্রায় এক ঘণ্টাকাল অবধি একটি লম্বা ড্রইং টেবিলের উপর একখানি বড় ম্যাপ ও কতকগুলি ছোট

ব্লু প্রিণ্ট প্ল্যান খুলিয়া ইঞ্জিনিয়ার মিত্তির সাহেব চন্দ্র বাবুকে একটি নুতন কাজ বুঝাইয়া দিতে ছিলেন, শেষ হইলে তিনি একটি মোটা মৌলমিন সিগার ধরাইয়া ঘরের মধ্যে গম্ভীর ভাবে পায়চারি সুরু করিলেন। চন্দ্রবাবু ঐ সমস্ত কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিতেছেন।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মিঃ মিত্র চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চন্দর তুমি বম্বের শ্যামাচরণ ঘোষকে কি চেনো? প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রবাবুর মুখ কান লাল হইয়া উঠিল, কিছু বিলম্বে একটু জড়িত স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ চিনি।

—এখানকার এম, আই সিরাজী—যাদের রুবি মাইন ডিষ্ট্রিক্ট মোগকে বড় কারবার আছে, তাদের সঙ্গে ঐ শ্যামাচরণ বাবুর বছরে অনেক টাকার কায হয় জান কি?

—আজ্ঞে না।

—বোধ হয় দু'বছর পূর্বে তিনি ঐ কায উপলক্ষে এখানে এসে আমাদের গেষ্ট্ হন। আমি যখন পুনায় ছিলাম ছুটী পেলেই বম্বাই গিয়ে শ্যামাচরণের বাড়ী আড্ডা জমাতাম। সে আমায় শিবু বলে ডাকতো বলতো শঙ্কর এত বড় একটা যুক্ত অক্ষরওয়ালা নাম উচ্চারণ করতে বহুত দম নিকলে যায়।

গত বারে শ্যাম যখন এখানে আসে তখন আমায় বলেছিল যে তার জামাইটি প্রায় এক বছরের উপর হলো নিরুদ্দেশ তাই এদেশে আমি যেন তার একটু সন্ধান করি আর কোন খবর পাবামাত্র যেন শ্যামকে জানাই। এই উদ্দেশ্যে সে তার জামাইএর নাম, বয়স, চেহারার মোটামুটি বর্ণনা আমার তখনকার ডাইরিতে লিখে দিয়ে গিয়েছিল।

আমি তখন হতেই শ্যামের জামাইটির সন্ধানে ছিলাম কিন্তু তার কোন উদ্দেশ পেলাম না। আশ্চর্য এখন বুঝতে পারছি আমি যার খোঁজে ব্যস্ত তিনি তখন এই শহরে স্বাধীন প্রকাশ্য ও ভদ্রভাবে বসবাস

করছেন, চাকরি ব্যবসা আরও কত কি নিয়ে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করছেন।

আরও মজার কথা আজ প্রায় কিছু কম, বছর কেটে গেল এই বাবাজীবনটি আমার চোখের উপর, হাতের নিকট, পরম আত্মীয় ভাবে থাকা সত্বেও আমরা তাকে চিনতে পারিনি।

কাল রাত্রে আমার বুড়া মায়ের মারফত কিছু সূত্র পেয়ে, আজ সকালে ঐ ডাইরির লেখা মিলিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ। এতদিন পর শ্যামের জামাই বাবাজী কে খুঁজে পাওয়া গেছে বটে, পরে চন্দ্র বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন এ বিষয়ে কি করা যায় বলত বাবাজী? চন্দ্র তদবস্থ ঘর্মাক্ত ও নিরুত্তর।

বিবেচনা করিবার কিছু সময় দিয়া মিঃ মিত্র পকেট হইতে একখানি লিখিত টেলিগ্রাফ ফরম্ চন্দ্রবাবুর হাতে দেখিতে দিলেন। চন্দ্রবাবু তাহা পাঠ করিলেন,—

Matimala. Bombay

Traced Chander O.K. All Round

Siboo

Sankar Lall Mitra Rangoon

(মোতিমালা, বম্বে

চন্দরের সন্ধান পেয়েছি সমস্ত মঙ্গল শিবু)

"মোতিমালা" শ্যামাচরণ বাবুর আপিষের সংক্ষিপ্ত ঠিকানা।

মিঃ মিত্র আবার বলিতে লাগিলেন—শোনো চন্দর তোমাদের আভ্যন্তরিক ও পারিবারিক ব্যাপারে, তোমার মত না নিয়ে হাত দেওয়া আমি উচিত বিবচনা করি না।

এই সমস্ত আত্মীয়তার স্থলে এমন অনেক কিছু ঘটে যাতে সাময়িক এমন কি চিরকালের জন্য আত্মীয়তার বিচ্ছেদ ঘটে যায়। অনেক সময় হয়ত সে সকল ব্যাপার অন্য কাহার নিকট প্রকাশ করা যায়না। বিশেষ করে তোমার এই লম্বা অজ্ঞাত বাসের কারণ আমায় অতিশয় শঙ্কিত করেছে। এ সম্বন্ধে তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তা আমার সচ্ছন্দে বলতে পার। যাতে সকল দিকে ও উভয় পক্ষের সুবিধা হয় আমি সেই চেষ্টাই করব চন্দর।

এই সময়টুকুর মধ্যে চন্দ্রবাবু নিজের বিব্রত ভাবটা কাটাইয়া লইয়া বলিলেন—আপনি যে আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, সে বিষয়ে এখনও কি আমার কোন সন্দেহ থাকতে পারে কাকাবাবু? আপনি যা ভয় করছেন, সেরূপ কোন মনমালিন্য এ ক্ষেত্রে নাই, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

আমার শ্বশুর মশাই যখন তাঁর দশ বছরের বালিকা মেয়েকে নিয়ে বম্বে চলে যান, তখন তিনি আমার মার নিকট দস্তুর মত অনুমতি নিয়ে তবে তাকে নিয়ে যান। আমার মাকে তিনি আরও আশ্বাস দিয়া যান যে—তিনি তাঁর কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেবেন যাতে তার গুরুজনে শ্রদ্ধা, ধর্মে মতি হয়। তাঁর কন্যার সংসার করবার মত বয়স হলেই তিনি তাকে আমার মার পায়ের তলায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

আমার বয়স তখন যদিও খুব অল্পমাত্র ছিল তবুও এ প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল, কাকাবাবু।

অপর পক্ষে আমি যখন মাকে আমার মাসীমার কাছে কাশীতে রেখে এদেশে চলে আসি, তখন শ্বশুর মশাইকে পত্র দ্বারা জানিয়ে ছিলাম যে —"আমি কোন সদুদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য বিদেশে যাচ্ছি, আপনার দেওয়া ঠাকুরের ছবিখানি বুক পকেটের মধ্যে সঙ্গে নিলাম, তিনিই আমার সকল বিপদ হতে রক্ষা করবেন। আমার ফিরতে যদি কিছু বিলম্ব

হয় আমার অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার সন্তানদের মধ্যেই একজন রইলাম জানবেন।"

এখন দেখুন এ পর্যন্ত আমাদের কোন পক্ষেরই কোন ত্রুটী বা মনোমালিন্যের কারণ হয় নি। এখন আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করেন তাই আমি মাথা পেতে নিতে বাধ্য!

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া মিত্তির সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চন্দ্রকে বুকে টানিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়া উঠিলেন—"সাবাস ছেলে বাবা তুমি—It is very wisely planed and carefully executed, বড়ই বুদ্ধির কাজ হয়েছে। জমাদার।

জমাদার সেলাম দিয়া দাড়াইল।—হুজুর

মিত্তির সাহেব তাহার হাতে টেলিগ্রাফ ফরমখানি দিয়া বলিলেন—ইয়ে তার আভি লগানে কো ভেজো আউর শশীবাবুকো বোলায় দেও।

জমাদার নিজের কাজে চলিয়া গেল ও শশীবাবু, সরকার মশাই হাজির হইলে মিঃ মিত্র তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের ২৮নং বাড়ী কবে খালি হ'য়েছে শশী?

—গত রবিবার পেনফোল্ড সাহেবরা চলে গেছে।

—বেশ, তুমি রহীম মিস্ত্রীকে নিয়ে ও বাড়িতে এখনই যাও, আমি চন্দরকে নিয়ে পরে যাচ্চি, সেখানে, কি ভাবে বাড়িটা পরিষ্কার ও মেরামত করতে হবে তা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসব, বুঝলে?

—যে আজ্ঞে আমি এখনই চললাম।

সরকার মশাই চলিয়া যাওয়া মাত্র, মিত্র মহাশয় চন্দরের মাথায় হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—বেঁচে থাকো বাবা, আমায় একটা বিষম সমস্যা থেকে তুমি বাঁচালে। কাল থেকে আমি ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম যে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কিছু গোলযোগ হয়েছে নয়ত এমন করে গা ঢাকা দিলেই বা কেন তুমি? আর সেই গোলটি বোধ হয়

আমাকেই মধ্যস্থ হয়ে মেটাতে হবে কারণ তোমরা উভয় পক্ষই আমার পরম আত্মীয় স্থানীয়। আঃ বাচা গেল, চল বাবাজী একটু কায কর্ম এইবার দেখা যাক, চল।

২৮ নম্বরে আসিয়া ঐ বাড়ীর সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে মিত্র সাহেব যেরূপ ব্যয় সাধ্য নির্দেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে বোঝা গেল বাড়ীটি সম্পুর্ণ নূতনরূপ পাইয়া যাইবে। চন্দ্রবাবু হিসাবী লোক চিন্তা করিয়া বলিলেন—এত কাজ বাড়ালে ত মেরামতি খরচ অনেক বেশি পড়ে যাবে কাকাবাবু। এবার ভাড়াও তাহলে বাড়াতে হবে।

মিঃ মিত্র। তোমার ইকনমিক্স তাই বলে কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার ঠিক বিপরীত হবার সম্ভাবনা। যেরূপ কৃপণ, না না হিসাবী লোক ভাড়া নিচ ছেন তাতে মোটেই হয়ত ভাড়া আদায় হবে না।

চন্দ্র সবিস্ময়ে—কি বলছেন কাকাবাবু, তবে জেনে শুনে তেমন লোককে আনবার দরকার কি? আমায় হুকুম দিন না,—হুঁঃ এমন বাড়ীর আবার ভাড়ার অভাব?

মিত্র মশাই তখন হাসিয়া কহিলেন—তুমি তা হলে একাজে কিছু ব্রোকারেজের আশা রাখ, কেমন?

—আমরা হলাম প্রপার্টি এজেন্ট, তাতেই বা দোষ কি বলুন। মিত্র সাহেব সেইরূপ হাসিমুখে বলিতে লাগিলেন—ভেরি সরি চন্দর এ কাযে তোমার ব্রোকারেজটা মারাই গেল বোধ হয়, পার্টি একটু হোষ্টাইল রকম।

—কে বলুন না কাকাবাবু, তাকে আমি একবার দেখে নিই, কেমন হোষ্টাইল।

—তাঁকে এখনও তুমি ভাল করে চেন না। তোমাকে দেখাবার জন্যই তাঁকে আমি আনাচ্চি গো। তিনি হচ্চেন বাবু শ্যামাচরণ ঘোষের কন্যা, শঙ্কর লাল মিত্রের পুত্রবধু, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয়ের কুললক্ষ্মী শ্রীমতী—রায়—নামটি এখনও শুনি নি কিনা তাঁর।

চন্দ্রবাবু ঘাড় হেঁট করিয়া মনে মনে বলিলেন—জায়গাটা কিছু শক্ত বটে, ইকনমিক্সের হাতার বাইরে।

৫০

বম্বে হইতে টেলীর উত্তর আসিল :—

"Delighted, leaving with daughter. Shall wire departure from Madras. Meet professor Ghose, Rangoon College"— Motimala Bombay,

(অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম মেয়েকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছি, মাদ্রাজ হইতে যাত্রার সময় জানাইব—রেঙ্গুন কলেজের প্রোফেসার ঘোষের সহিত দেখা কর।)

প্রোফেসার ঘোষটি হইতেছেন এস ঘোষ,—সতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ পি, আর, এস M.A. P.R.S. সম্প্রতি একমাস মাত্র হইল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস লইয়া রেঙ্গুন কলেজে ম্যাথামেটিক্স, অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতার ভার লইয়া আসিয়াছেন। সতীশবাবু অতিশয় সরল ও শান্ত স্বভাব লোকটি এবং সম্পূর্ণ দুনিয়াদারী বর্জিত। ব্যায়াম পুষ্ট অতি সুন্দর চেহারা, অনেকটা ইংরাজী ধরণের হাব্‌ভাব্‌। তিনি কলেজ কোয়াটার থেকে প্রাতভ্রমণে বাহির হইতেছেন। কলেজের উর্দিপরা একজন চাপরাসি সেলাম জানাইয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত একখানি টেলিগ্রাফ কভার তাঁহার হাতে দিল, বলিল ঘোষ সাহেব কো বাস্তে।

—হাঁ ঠিক হ্যায় বলিয়া ঘোষ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তাহা পড়িয়া দেখিলেন—

Prof, Ghose

Rangoon College, Rangoon.

Meet Chander at Engineer Sankar Mitra York Road. Samacharan

সেইখানেই বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"চন্দর", তবে কি আমাদের জামাই চন্দ্র ? আহা তাই যেন হয়। তাঁহার ভগ্নীর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। আরও এক কথা আসিবার সময় বাবা শঙ্কর বাবুর সহিত দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রায় এক মাসের উপর হইয়া গেল, আমি সে কথা একবারে ভুলেই বসে আছি। বেটার লেট্ স্থান নেভার এক কাজে সেটাও সেরে আসা যাক্।

প্রোফেসর ঘোষ লাঠি রাখিয়া ছাতিটি হাতে লইয়া ইয়র্ক রোড যাত্রা করিলেন। ঠিকানায় পৌছিয়া ফটকে মিঃ মিত্রের নামের প্লেট দেখিতে পাইলেন। হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সামনের বাগানে একজন ড্রেসিং গাউন পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেড়াইতেছেন। প্রোফেসর ঘোষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি রেঙ্গুন কলেজ হতে আসছি, মিঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করবার এখন কি সুবিধা হতে পারে ?

—মিঃ মিত্র এই আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আপনি কি প্রোফেসর ঘোষ ?

—না না আপনার কাছে আমি আপনিও নই, প্রফেসরও নই, কেবল মাত্র বন্ধের শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র সতীশ। এই কথা বলিয়া সতীশ সেইখানেই নত হইয়া শঙ্কর বাবুর পদধুলি লইলেন।

সতীশের কাঁধে হাত রাখিয়া মিঃ মিত্র বলিলেন—চল বাবা ভিতরে চল। আগ্রহ ব্যস্ত সতীশ জিজ্ঞাসা করিল চলুন, কিন্তু তার আগে বলুন এই চন্দ্র কি আমাদের জামাই চন্দর রায় ?

—তাতে কোন ভুল নেই, দেখলেই চিনতে পারবে।

—চিনতে পারব কি না তা ঠিক বলা যায় না, ছেলে বেলায় বয়স যখন তার ১৫।১৬ তখন এক দিন মাত্র তাকে বর বেশে দেখেছিলাম। সে ত অনেক দিনের কথা হলো, এখন নিশ্চয়ই তার অনেক পরিবর্তন

হয়েছে, তবে তার ঘাড়ের পাশে চুলে একটি চক্র আছে, সেটি অনেকেরই চোখে পড়ে আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম।

মিঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন তবে আর ভাবনা কি যখন মার্ক অফ আইডেন্টিফিকেসন রয়েছে, দাগী চোর আর কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, বাবু!

ঘোষ। দাগী হয়েও যে রকম গা ঢাকা হয়েছিল, অনেক বেদাগী সেরূপ পেরে ওঠে না কিন্তু।

মিঃ মিত্র বলিলেন—চন্দরের থাকবার বাড়ী এ রাস্তার ২৮ নম্বরে এখন মেরামত হ'চ্চে তাই সে শহরের মধ্যে কিছু দিনের জন্য একটি বাসা নিয়ে আছে। এ সময় সেখানেও তার দেখা পাওয়া যাবে না। নিশ্চয় সে এতক্ষণে কাজে বেরিয়ে পড়েছে। তুমি বিকালে পাঁচটার পর হতে এইখানেই তার দেখা পাবে, আমি তার ব্যবস্থা করে রাখব।

—তবে এখন উঠি অনুমতি করুন।

—আরে তাও কি হয়, একটু চা ও মিষ্টি মুখ না করে তোমায় যেতে দেওয়া যায় কি, বাবু?

—আজ্ঞে আমি চা খাই না, তবে মিষ্টিমুখ খুব বেশি করেই করে থাকি বলিয়া ঘোষ হাসিতে লাগিলেন।

—কী তুমি বম্বেতে মানুষ হয়েছ, এতদিন সেখানে কাটালে আর বলছ "চা খাইনে" আশ্চর্য কথা। আমি ত দেখে এসেছি অমন চায়ের চলন দুনিয়ায় অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

প্রঃ ঘোষ মিষ্টমুখ করিয়া তখনকার মত বিদায় লইলেন।

৫১

বেলা এগারটা, আজ মাদ্রাজ মেলে শ্যামাচরণ বাবুর রেঙ্গুন পৌছাবার ঠিক আছে, সকলেই তাঁহাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

Port Trust পোর্ট ট্রাস্ট আপিস থেকে মিঃ মিত্রের খাস আর্দালী ফোনে জানাইল—"হুজুর মাদ্রাজ মেলকা বাওটা (সিগ্‌নাল) উঠায়া, কাপ্‌তান স্মিথ সাহেব আপকো খবর দেনে বোলা, ঘণ্টাকা অন্দর জাহাজ জেঠিমে লাগ্ যায়েগা।"

ঠিক হ্যায় তুম্ জেঠিমে হাজির রহো।

সুষমা ফোনের খবর শুনিয়া ও তাহার ঐরূপ উত্তর দিয়া ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল—বাবা, বাবা মাদ্রাজ মেল সিগনাল দিয়েছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ জেঠিতে লাগবে। চন্দ্রদাকে কি ডাকব?

—হাঁ ডাকো আর সতীশকেও ত একবার খবর দিতে হবে।

—সতীশবাবু ত এখানে নেই বাবা, তিনি উইক এণ্ডে পিণ্ড হয়ে থানাপিন বিলে স্নাইপ স্যুটিং এ গিয়েছেন তার ফিরতে রাত্তির আটটা যার নাম। চন্দ্রদা আজ সকালে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলেন। সতীশবাবু বোধ হয় এঁদের আসবার খবর জানেন না।

—তবে ত তাকে একটা সারপ্রাইজ্ দিতে পারা যাবে। চন্দ্র আসিলে মিঃ মিত্র বলিলেন—চন্দর তৈরি হয়ে নাও এঁদের জাহাজের সময় হয়ে এল।

—আজ্ঞে আপনি যখন যাচ্ছেন, তখন আমার যাবার আর দরকার কি? মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

—বাঃ তোমাকে দেখবার জন্য তাঁরা কত না ব্যাকুল হয়ে আসছেন আর তুমি যাবে না, তা কি কখন হয় ?

—আজ্ঞে, বাড়ীতে একজনকে ত থাকতে হবে। আমি তাঁদের বাড়ীতেই রিসিভ করব। সেখানে যেতে আমার একটু…

—একটু কি চন্দরদা লজ্জা করছে, বলিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল। চন্দ্র মিনতির সুরে চুপি চুপি সুষমাকে বলিল—তুমি যাওনা ভাই কাকা বাবুর সঙ্গে। লজ্জাত একটু হবেই, সত্যই ত আমি তাঁদের কাছে একটু দোষী হয়ে আছি ভাই।

তুমি কী যে বল চন্দর বলিয়া মিত্তির মশাই হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু চন্দ্রকে জেঠিতে যাইতে রাজি করান গেল না।

চন্দ্রবাবু তখন বলিলেন—কাকাবাবু সুসা কেন আপনার সঙ্গে যাক্ না, তাহলে আরও ভাল দেখাবে, মনে হয়।

মিঃ মিত্র। দেখ দেখি ছোকরাদের কাণ্ডটা, একজনের শিকারের বাতিক আর একজনের লজ্জার খাতির, এখন কি করা যায় বল—তাই হোক তুই চল্ মা বুড়া আমার বৌমাকে বরণ করে আনবি।

জাহাজের যাত্রীরা দৃষ্টি-গণ্ডির মধ্যে আসিতে দেখা গেল—বিরাট দেহ শ্যামাচরণবাবু তাঁহার কন্যাকে পার্শ্বে লইয়া আপার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্যামবাবু উপর হইতে মিত্র মহাশয়কে দেখাইয়া দিলে তাহার কন্যা ফল্‌সা রংএর জর্জেট সাড়ীর চওড়া সোনালী পাড়টি মাথার উপর তুলিয়া দিলেন।

দেখা গেল ইন্দুপ্রভার রং ও গড়ন টাটকা জাফরানি ক্ষীরের মত মাজা ও মোলায়েম। সুডৌল হাতের আঙুলগুলি যথার্থই চাঁপার কলির ন্যায়, লালছড়া রঞ্জিত উজ্জ্বল বাহারে দুটি ডবডবে চক্ষু। আর সর্বাপেক্ষা সুন্দর তার চুল,—যেমন ঘোর কাজল-কালো সেইরূপ

কোঁকড়ান। ভাদ্রের ভরা নদীর মত নিটোল যৌবনশ্রী প্রতি অঙ্গে পরিস্ফুট, মুখের ভাবটি অতীব কমনীয়।

এ হেন প্রভাকে দেখিয়া উৎসাহ ও প্রশংসমান কণ্ঠে সুষমা বলিল—বাবা, তোমার বৌমাটিকে দেখছি যে পরমা সুন্দরী, একেবারে ফার্ষ্টক্লাস। সত্যি বলছি বাবা, আমার বড় ভয় ছিল পাছে চন্দরদার বৌ দেখতে খারাপ হয়। না তা মোটেই নয়, একেবারে ফার্ষ্টক্লাস যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণটি!

—আরে পাগলী চেহারা একটু খারাপ হলে ঘরের বৌকে কি ফেলে দেওয়া যায়। নাঃ, খাসা চেহারা মেয়েটির।

উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য পৃথক গ্যাংওয়ে—সিঁড়ি প্রথমেই লাগান হইল। অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পিতা পুত্রী নামিয়া আসিবামাত্র, শঙ্কর বাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু শ্যামাচরণবাবুর হাতে হাত লাগাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং প্রভা শঙ্করবাবুকে প্রণাম ও তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিল।

প্রথমেই ঘোষ মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ চন্দর কোথা? সতীশকেও ত দেখছি না? মিঃ মিত্র হাসিতে হাসিতে কহিলেন—আর বল কেন, বুড়োকে এগিয়ে দিয়ে তারা ব্যাক্ গ্রাউণ্ডে আছে। চল বাড়ীতে সকলের সঙ্গে দেখা হবে।

এই সময় সুষমা আসিয়া ঘোষবাবুকে প্রণাম করিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে মা লক্ষ্মী? উত্তরে শঙ্কর বাবু বলিলেন——ওটি মিত্তিরদের মেয়ে, বাবার সঙ্গে তার নতুন বৌমাটিকে বরণ করে নিতে এসেছেন।

—বটে, তবে এস মা দুজনের পরিচয় করে দিই!

—আমি পরিচয় করে দিচ্ছি হে শ্যাম। মিঃ মিত্র প্রভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখ মা আমি হচ্ছি তোমাদের কাকাবাবু, আর ইনি হচ্ছেন এই বুড়ো ছেলেটির ছোট মা, বুঝতে পারলে মা?

ইন্দুপ্রভা ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল— সে বুঝিতে পারিয়াছে।

ইত্যবসরে চাপরাসী ও কুলিরা মালপত্র ঠেলা গাড়ীতে চড়াইয়া রওনা হইয়াছে। প্রথম ব্রাউনবেরীতে মেয়েদের উঠাইয়া দিয়া, দুই বন্ধু শ্যাম ও শঙ্কর পরের খোলা ফিটনে চড়িয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম গাড়ীর মধ্যে যুবতী দ্বয়ের আলাপ পরিচয় হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

প্র। তোমায় কি বলে ডাকব ভাই, নামটা বলে দাও। আমার নাম শুনবে ইন্দু-প্রভা একদম সেকেলে পুরণো নাম, নয়? তবে সকলে আমায় প্রভা বলেই ডাকেন।

সু—আমার নাম সুষমা, চন্দরদা আমার নাম দিয়েছেন স্বসা!

প্র—অমন করে নাম খারাপ করাত ভারি অন্যায় ভাই।

সু—তিনি বলেছেন তোমার সামনে এখন থেকে আমায় আমার ভাল নাম নিয়েই ডাকবেন।

প্র—এত যার শোভা তার সুষমা নামটি নিশ্চয় বেশ মানানসই হয়েছে।

সু—তুমিও রূপে কি কিছু কম যাও ভাই। তোমায় দেখে আজ আশ্চর্য হচ্চি, এই ভেবে যে তোমার মত এমন বৌকে চন্দরদা এতদিন কি করে চোখের আড়ালে রেখে ছিলেন। এই সেদিন পর্যন্ত আমরা জানতামই না যে ওঁর বিয়ে হয়েছে।

প্র—আমাদের খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিলো কি না দেখলে এখন হয়ত চিনতেই পারবেন না। আমার তখন দশ বৎসর মাত্র বয়স।

সু—আর তুমি চিনতে পারবে ত?

প্র—তা ঠিক নয় ভাই, মেয়েমানুষ যাঁকে একবার স্বামী বলে দেখেছে তাঁর যত বদল হোক তাঁকে বোধ হয় ভুলতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে

আজ একটা কথা– তোমায় বলতে লজ্জা করছে, আমি গত সাত বছর তাঁকে দেখিনি, তাই তাঁর একখানি ফটো পাবার জন্য কতই না ইচ্ছা আমার হতো।

বোধ হয় শুনেছ আমার বাবার বড় জুয়েলারির কাজ আছে। আমার এই অবস্থা হওয়ায়, আমাকে ভোলাবার জন্যে বাবা খুব পছন্দসই সুন্দর সুন্দর দামী গয়না আমায় এনে দিয়েছেন। সত্যি বলছি ভাই ঐ সময় যদি কেউ আমায় ওঁর একখানি ফটো যোগাড় করে দিতে পারত, আমি তার বদলে আমার সমস্ত গহনাগুলি তার হাতে তুলে দিতে কষ্ট বোধ করতুম না।

জাহাজে আসবার সময় আমি মতলব করেছি যে তিনি যতক্ষণ না আমায় তাঁর একখানি ফটো প্রেজেণ্ট করবেন, ততক্ষণ আসল মানুষটির সাথে আমি আলাপ করবো না।

সুষমা হাসিতে হাসিতে বলিল—বল কি বৌদি, আলাপ না করে থাকতে পারবে?

—আমি যে পুড়ে পুড়ে অনেক শক্ত হয়ে গেছি ভাই।

—আচ্ছা, আজই আমি তোমায় দাদার ফটো সংগ্রহ করে দেবো।

—প্রভা সকৃতজ্ঞ ও সজল নয়নে সুষমার হাত নিজ হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

গাড়ি দুখানি বাড়ীতে পৌঁছিল। মেয়েরা অন্দরে চলিয়া গেলে পর চন্দ্র আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে প্রণামাদি শেষ করিলেন। ঘোষ মহাশয় সাশ্রু নয়নে তাহাকে বুকে জড়াইয়া মনে মনে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

৫২

চন্দর দা আপনার একখানি ফটো আমায় আজ দিতে হবে।

—কোথায় পাবো সুষমা দিদি, আমি ত কোন দিন ও সব বাজে খরচ করে জঞ্জাল বাড়াইনি, বোনটি আমার।

—তা বললে চলবে না এখনই তার ব্যবস্থা করুন তা হলে। গাড়ি তৈরি আছে চলুন ছবি তুলে আসা যাক্।

—আর কেউ যাবে নাকি ?

—হঁা গো, বৌদিও যাবেন।

—যাবেন বুঝি ওঃ তাই এত তাড়া। তা আজই কেন, অন্য দিন সুবিধামত গেলেই ত হতে পারে।

—তা যদি করলে হতো, তবে আপনাকে এখন বিরক্ত করতাম না। উঠুন শীগ্‌গির কাপড ছেড়ে রেডি হয়ে নিন। আয়ত কাল চক্ষু ঘুরাইয়া সুষমা দাদাকে বলিল—আজ জেটিতে যাবার সময় আমি আপনার কথা শুনেছি, এখন আমার কথা না রাখলে ভাল হবে না তা বলে রাখছি, এখন থেকেই।

চন্দ্রবাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন এই মেয়ে গুলো কি সিলি—নির্বোধ, কিছু মাত্র ইকনমির জ্ঞান নেই। এক জোট হয়েছে কি অমনি একটা হুজুক বাধিয়ে বসেছে।

প্রভাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া সুষমা চন্দ্রবাবুকে তাগিদ দিয়া বলিল—উঠুন দাদা। গাড়িতে উঠিয়া চন্দ্র বলিলেন 'এস সু'!

—মাপ করুন দাদা, এই দারুণ রোদে জেটিতে ঘুরে এমন মাথাটা ধরেছে যে দাঁড়াতে পারছি না। আজ আপনারা যান, কি রকম পোজ, হবে সেটা আমি ফোনে ভোলা বাবুকে বলে দেবো।

কোচ্ম্যানকে বলিয়া দিল "ফটো ষ্টোর মুলেপ্যাগোডা, জল্দি যাও"। চক্রান্তটা বুঝে নিয়ে চন্দ্রবাবু খুশীই হলেন।

গাড়ির ভিতর জাঁকাইয়া বসিয়া প্রভার খাটো ঘোমটাটি আরও খাটো করিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বহুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে প্রভার লজ্জা রক্তিম মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না—এই কি সেই? সেই দশ বছরের ছোট্ট ফুট ফুটে পুঁটুরাণী আর এই অম্লান অটুট যৌবনশ্রীসম্পন্না—ইন্দুপ্রভা রায়। কোথায় সেই পল্লী পাদস্থিতা সংকীর্ণা জলস্রোত আর এই অমল ধবলা, তরঙ্গ বিধুনিতা স্রোতস্বিনী গঙ্গা? হইবে নাই বা কেন, দ্বিতীয়ার শীর্ণা চন্দ্রকলাই ত যথা সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রমায় পরিনত হইয়া থাকে?

সর্ব বিষয়ে আত্ম সংযমী চন্দ্রকান্ত সে ভাব পরিবর্তন করিয়া, মৃদুহাস্ত সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—তার পর প্রভারাণী বম্বেতে কিরকম ছিলে বলত? এই প্রথম প্রশ্নটিতে প্রভার হৃদয়ে একটি অনাস্বাদিত পূর্ব মধুর স্রোত বহিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে সেটি উপভোগ করিয়া সলজ্জ স্নিগ্ধ স্বরে প্রভা উত্তর করিল—কৈ আর ছিলাম?

—তার মানে?

—আসল বস্তু না থাকলে তার প্রভা কি করে থাকে বলুন?

—ইন্দু তবে এত দিন কোথায় ছিলেন?

—বর্ষার জঙ্গলে ভীষণ মেঘঝড় দুর্য্যোগের মধ্যে চাপা পড়েছিলেন যে। ইন্দু মানে ত ··এইটুকু বলিয়াই তার কথা বন্ধ হইয়া আসিল ও প্রভা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চন্দ্রবাবু নিজ চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিলেন না। পকেটে রুমাল খুঁজিয়া না পাইয়া চন্দ্র কোঁচার কাপড় দিয়াই প্রভার মুখ খানি মুছাইয়া দিলেন ও তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটি বুকে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

পরে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—এত দিন সেখানে বসে তুমি কি পড়া শুনা করলে তা আমাকে বল। এইটাই আমার প্রথম জানা দরকার। চুপ করে রইলে কেন, বল, বলবে না রাণী?

মৃদু মধুর ভাষায় প্রভা বলিল—বলব, আপনার কথা আগে বলুন না।

—নিশ্চয় বলব, সমস্ত খুঁটিয়ে বলা যাবে, কিছু বাদ যাবে না। তোমায় বলবো বলেই ত দিনের পর দিন ডাইরি লিখে রেখেছি। আমার এই জীবন সংগ্রামের কথা বড় দুঃখের কাহিনী, শুনতে শুনতে তুমি আবার চোখের জল ফেলবে। আমাদের এই মিলনের দিনটিতে থাকনা সেটা চাপা দেওয়া, অন্য কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য!

প্রভা আর একবার চক্ষু মুছিল।

চন্দ্র বলিল এইটুকু মাত্র শুনে রাখ রাণী—এই দুঃসময়ে ভগবান আমাকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—আমি তা জানি ও বিশ্বাস করি।

—কিসে?

প্রভা উর্দ্ধ দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিল—আমি যে প্রতিদিন ভগবানের নিকট আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে আসছি, তাতে আমার মন বলতো আপনি ভাল আছেন ও আপনাকে আমি আবার পাবো। এই ত পেলাম!

—ভগবান কারুর আন্তরিক প্রার্থনা বিফল হতে দেন না। আচ্ছা রাণী তোমার ঐ সম্মানের "আপনিটা" বাদ দাও, ওতে যেন একটু দূরত্ব এনে ফেলছে, না কি? তার পর।

প্রভা বলিতে লাগিল আমার কথা শুনে আপনি যদি খুশী—

—আবার আপনি কেন?

আমার কথা শুনলে তুমি যদি খুশী হও, তবে বলছি, কিন্তু এখন ত সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় হবে না, পারবো ও না।

—সংক্ষেপেই যা পার তাই বল।

আমার, নাঃ, আমাদের বিয়ের পর বম্বেতে গিয়ে বাবা আমায় প্রথমেই সেণ্ট-জেভিয়ার্সে গার্ল্‌স সেক্‌সনে ভর্ত্তি করে দিলেন। চার বছর লাগল আমার জুনিয়ার কেম্বিজ পাস করতে। ওখানে আমার কম্পালসারি টেক্‌নিক্যাল্‌ সাবজেক্ট ছিল সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং আর নারসিং, এ দুটিতেও ভাল করতে পেরে ছিলাম, আমি।

অতিশয় আনন্দের সহিত চন্দ্র বলিলেন—বাঃ অনেক কাজের মত কাজ করে ফেলেছ তুমি। শ্বশুর মশাই বেশ ভাল ব্যবস্থাই করে-ছিলেন ত।

আমার কলেজে জয়েন করবার ইচ্ছা ছিল, দাদাও তাতে মত করে ছিলেন, কিন্তু বাবা বললেন না অনাবশ্যক কলেজে পড়ার দরকার নেই, ও তো ভাল টাইপ রাইটিং শিখেছে, এখন থেকে ওকে আমার প্রাইভেট সেকরেটারির কায কর’তে হবে। তাতে আমার অনেক সাহায্য হবে, সংগে সংগে ও একটা লাইনের কাজ শিখে নিতে পারবে।

সেই থেকে আমায় দরকারি গোপনীয় সব চিঠি পত্র লিখতে ও ডেসপাচ্‌ করতে হয়। ফাইলিং ও ইণ্ডেক্স করে রাখতেও হয়, আমাকে।

চন্দ্র। শুনে বড় সন্তুষ্ট হলাম প্রভা। এবার ত আমাদের ছোট খাট কারবারে তোমায় জয়েন করতে হবে, মৃদু হাস্যে, কত মাইনে চাও?

—যদি কাজ করে মনিবকে সন্তুষ্ট করতে পারি তবে—তবে আচ্ছা ভেবে দেখি, কিছুক্ষণ থামিয়া—লাভের ষোল আনা।

—কাজ নেই বাবা আমাদের এমন সুন্দরী লেডী টাইপিষ্ট। কর্ত্তা সমস্তক্ষণ ওঁর মুখের পানে চেয়ে বসে থাকবেন,—কায কর্ম সব পণ্ড, তার ওপর আবার লাভের টাকার ষোল আনা, না পারা যাবে না।

—দেখো না পেরে, ভয়ে যেন আবার গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ো না।

—না গো না, চন্দ্র রায়ের আর সে ঝাঁঝ নেই, সে ইকনমিক বাধাও নেই। আচ্ছা যদি কিছু মনে না কর তবে তোমার কথার মাঝেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই অতি অল্প কথাবার্ত্তাতেই মনে হচ্চে না ত যে তুমি একটি বিলাতি স্কুল ফিনিশ। দেখছি ত তোমার মনের গড়নখানি একেবারে খাঁটী আমাদের বাঙালী মা বোনদের মত।

প্রভা সামান্য উত্তেজিত হইয়া বলিল—আমি ক'দিনের জন্যই বা মেম সাহেবদের স্কুলে যাওয়া আসা করেছি? মা বাবার শরীর থেকে যে আমি জন্মেছি, তাঁদের কোলেই আজ পর্যন্ত মানুষ হচ্চি। তা ছাড়া বাবা আমায় সর্বদা বলেন—আমি বাপু তোমার শাশুড়ীর কাছে প্রতিশ্রুত আছি, যে তোমাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তুমি তাঁদের বনিয়াদি বংশের উপযুক্ত বধূরূপে গড়ে ওঠ, তোমার গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ধর্মে মতি হয়।

ঐ জন্য বাবা ঠাকুরের "কথামৃত" যোগোদ্যানের "তত্ত্বমঞ্জরী" প্রভৃতি আরও অনেক ঐ রকম বই আমায় আনিয়ে দিতেন, কখন নিজেও পড়াতেন ও বুঝিয়ে দিতেন।

—শুনে বড়ই সুখী হলাম রাণী তোমার শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভালই হয়েছিল, তোমার ঐ সময়টা মোটেই অপব্যায় হয় নি।

অভিমানে ঠোট ফুলাইয়া, চোখে হাসি ফুটাইয়া প্রভা বলিল—হুঁ! তা বই কি, অপব্যয় হয়নি বই কি?

চন্দ্রবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সেটা পূরণ করবার সময় এখনও ত ফুরিয়ে যায়নি গো ঠাকরুণ, না হয় এবার চেষ্টা করে সে ক্ষতিটা পূরিয়ে নিও।

ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রভার গণ্ডদেশ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল এবং ঠোঁটে একটু চাপা হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল, তাহার নিকট হইতে কোন মৌখিক উত্তর আসিল না।

অল্প থামিয়া প্রভা আবার বলিতে আরম্ভ করিল—দেখ আমাদের বম্বের বাসায় অনেক গেষ্ট্ আসেন ঐ সময় সংসারের সকল কাজেই আমায়, মাকে সাহায্য করতে হয়। মা বলেন—যে সংসারে বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের হাতে ঘর সংসারের কাজ না করে সে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না।

বাবার নিজের খানসামা লক্ষণ—যে আজ আমাদের সংগে এসেছে, রয়েছে ত, মা কিন্তু রোজ নিজের হাতে আঁচল দিয়ে বাবার জুতো মুছে রাখেন, তাঁর আপিসের কাপড়, বেরোবার সময় হাতে হাতে যুগিয়ে দেন। আমি জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলেন—আরও কিছুদিন যাক্, আপনিই বুঝতে পারবি। এখন কতকটা বুঝতে পারি এই কাযগুলি করে তিনি কত না সুখ ও সান্ত্বনা পান।

পরিহাস তরল কণ্ঠে প্রভা আবার বলিতে লাগিল—আর একটা কাজ আমি লুকিয়ে করতুম সেটা তোমার কাছে বলতে লজ্জা হচ্চে।

—কী এমন কাজ?

—বাবার সঙ্গে "বসুমতী" আপিসেব মালিক মুখুয্যে মশাইএর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, শুনেছিলুম তাঁরা গুরুভাই। উপেনবাবু (বসুমতীর প্রবর্তক স্বনামধন্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) একবার আমাদের বম্বের বাসায় এসেছিলেন, আমি তখন ছেলে মানুষ আমায় তিনি অনেক বই দিয়েছিলেন তার মধ্যে রমেশ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলী একখানি ছিল ঐ বইগুলি আমার বড় ভাল লাগত, আমি অনেকবার করে ঐগুলি পড়তাম। বসুমতী "সাহিত্য মন্দিরে" নতুন বই ছাপা হলেই মুখুয্যে মশাই সেখানি বাবাকে পাঠিয়ে দিতেন। ওঁদের সমস্ত গ্রন্থাবলী ও অনেক বাঁধান মাসিক পত্র আমার ঘরের আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছি, আর অনেক রাত্তির জেগে আমি সেগুলিকে মাথায় ঢোকাতুম। এটা কি কিছু অন্যায় কাজ হয়েছে?

হাসিতে হাসিতে চন্দ্র বলিলেন—শুধু অন্যায়, সিম্প্‌লী ক্রিমিন্যাল, ডেকইটী উইথ মাডার!—ডাকাতি খুন জখম—সাত মাস ফাঁসি!

তাই ত এতক্ষণ ভাবছিলাম, আমার প্রভা পার্সি, গুজরাটিদের দেশে মানুষ হয়ে এমন বাংলায় কথা-শিল্পী হলেন কি করে? এই যে ঠিকানায় এসে পড়া গেছে।

৫৩

গাড়ি থামিল। সম্মুখে সুমহান "সুলে-প্যাগোডার" সিংহ দ্বারের প্রতি নজর পড়িতেই, চন্দ্র সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—চল চল প্রভা প্রথমেই মন্দিরে গিয়ে ভগবান বুদ্ধদেব দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসি। পরে অন্য সব কাজ, কেমন?

পবিত্র দেবায়তন প্রাঙ্গনে প্রবেশ মাত্র চারিদিকের অতিসুন্দর পরিবেশ, অনুপম সুউচ্চ শ্বেত মর্মর নির্মিত দেব মূর্তি গুলির দিকে বিস্ময় বিস্ফুরিত চক্ষে চাহিয়া সোচ্ছাসে প্রভা বলিয়া উঠিল আঃ—হাঃ কি সুন্দর!

উভয়ে প্রণাম করিলে চন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—রাণী ঠাকুরের কাছে কি বর প্রার্থনা করবে?

প্রভা অতি করুণ নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—কি চাইব তুমি আমায় বলে দাও।

তখন চন্দ্রবাবুর শিক্ষামত, দেব মূর্তির পীঠতলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুক্তকরে একযোগে শ্রীভগবান পদে উভয়ে প্রার্থনা জানাইলেন:—

হে করুণাময় ভগবান তথাগত, হে শাক্য, হে গৌতম হে বুদ্ধদেব !

তোমার অসীম করুণায়, এখন হইতে আমরা সর্বতো-ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

সংসার যাত্রার সুগম পথ দেখাইয়া দিবার জন্য, তুমি আমাদের হৃদয়াকাশে ধ্রুব নক্ষত্ররূপে প্রকাশমান হও !

তোমার পবিত্রতম পাদপদ্মে আমাদের ভক্তি অচলা ও অকপট হউক !

পুনরায় ঠাকুর প্রণাম করিয়া প্রণয়ী যুগল কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে ভক্তি গদ গদ স্বরে প্রভা বলিল—কত সৌভাগ্য আমার, এই পবিত্র দেব সান্নিধ্যে, আমার পরমগুরু স্বামীর—নিকট হতে যে দীক্ষা পেয়ে আজ আমি নবজীবন আরম্ভ করলাম, এটি আমার আজীবন রক্ষা কবচ স্বরূপ হয়ে থাকুক ! এখন আর আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই, এই বলিতে বলিতে প্রভা গলবস্ত্র হইয়া পতি চরণে প্রণতা হইলেন।

তখন তাহাদের উভয়ের মুখশ্রী যেন শ্রীভগবানের আশীর্বাদ পুষ্ট হইয়া অধিকতর উজ্জল ও কমনীয় ভাব ধারণ করিল।

তারপর বেশ উৎসাহের সহিত সেণ্টজেভিয়ারসের ছাত্রী জেভেরিয়ান ষ্টাইলে স্বামীর সহিত সমতালে পা চালাইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ ফটোষ্টোরে প্রবেশ করিলেন !

৫৪

দুই দিন হইল ঘোষ মহাশয় তাঁর কন্যাকে লইয়া শঙ্কর বাবুর বড় বাড়ীতে উঠিয়াছেন। সম্মানিত অতিথি ও পুরাতন বন্ধুর সমাগমে মিত্র মিত্রের বাটীতে বেশ একটু সমারোহ চলিতেছে। বড় বৈঠকখানায়

ফরাস বিছানার উপর গোটা কতক মোটা মোটা তাকিয়া পড়িয়াছে। শ্যামাচরণ বাবু তাঁর ছয় ফিট দু ইঞ্চি লম্বা এবং তিন মণ ওজনের সুবিপুল বপুটিকে উহার মধ্যে একটি তাকিয়াতে রাখিয়া অর্দ্ধ শয়ান। লম্বা নল আলবোলায় সুগন্ধী তামাক চলিতেছে। পার্শ্বের ছোট কামরায় অন্য আরও কিছুর ব্যবস্থা আছে কি না তাহা বাহির হইতে দেখা যাইতেছে না।

অন্য অন্য কথার পর শঙ্কর বাবু বলিলেন—দেখ হে শ্যাম যখন তোমার ছেলে, মেয়ে, এমন কি হারনো-মানিক জামাইটি পর্যন্ত রেঙ্গুনে জমায়েৎ হয়েছে, তখন এবার তোমার গিন্নীকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল, কি বল ?

আরে ভাই চন্দরকে দেখবার জন্য গিন্নী ত পাগল হয়ে উঠেছেন, কিন্তু কি করি ছোট ছেলেটার একজামিন পড়ে গেল কাজেই তাঁকে রেখে আসতে হল। চন্দর আমাদের যথার্থই হারানো-মাণিক, ভারি বুদ্ধিমান ছোকরা, দেখ অত অল্প বয়স হতেই কেমন সবদিক বাঁচিয়ে চলে এসেছে।

আমাকে একটু ইঙ্গিতে জানালে আমি সহজেই ওর একটা সুবিধা-মত কাযের যোগাড় করে দিতে পারতাম। আমায় কোন কথাই জানায় নি ভাই।

গম্ভীর ভাবে শঙ্কর বাবু বলিলেন—বুদ্ধির চেয়ে ওর চরিত্রবল অসাধারণ, আমি নিজে ও কৃপারাম শেঠ অনেক ক্ষেত্রে তার পরিচয় পেয়ে সত্যই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার স্ত্রী একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি এত শক্তি কার থেকে পেয়েছ বাবা ? উত্তরে চন্দর বলেছিল—কাকীমা দুর্বলের বল ভগবান তাঁর দুর্বল সন্তানদের আত্ম-রক্ষার জন্য শক্তি দিয়ে থাকেন, তাঁর দেওয়া শক্তি না পেলে মানুষের কোন কিছু করবার সাধ্য নাই। এই ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ওকে এত কষ্ট

এত বিপদ এত প্রলোভনের মধ্যে শক্তি দিয়ে রক্ষা করে আসছে। আহা বেচারী কত কষ্টই না পেয়েছে শারীরিক মানসিক দুই রকমই।

তুমি বলছ, চন্দ্র তোমায় কিছু জানায়নি, ওর মত লোক জানাবে না ত কাকেও। ও হলো রায় বংশের একমাত্র বংশধর, আসল জাত সাপ কারো কাছে মাথা নত করবে না, আপনার চেষ্টায় আপনি উঠবে। একমাত্র বাঁশী বাজিয়ে ওদের বশকরা যায় অর্থাৎ শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা।

শ্যাম বাবু বলিলেন আমি জানি চন্দরের মা ও একজন বেশ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক তাঁরও মনোবলের অভাব নাই। অনেক মনোকষ্ট সহ্য করেই তিনি একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে এতদিন আছেন তবুও তাঁর অত্যধিক স্নেহ প্রবণতার দ্বারা সন্তানের উন্নতি পথে বাধা দেন নি, সহজ কথা!

আমি আমার মার অনুরোধে অতি অল্প বয়সেই ইন্দুটার বিয়ে দিয়ে দেবার পর যখন চন্দরের মার সংগে দেখা করে প্রস্তাব করলাম—আমি এখন মেয়েকে আমার কছে বম্বেতে নিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি। সংসার করবার মত বয়স হ'লে আমি আপনার বৌকে আপনার পায়ের তলায় পৌছে দিয়ে যাব।

তিনি অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বলেছিলেন—বেহাই মশাই, আপনার এই ব্যবস্থাই, সকল দিক বিবেচনা করে, আমার ভাল বলে মনে লাগছে। আমার শখ ছিল আমার একটি মাত্র বৌকে নিজের কাছে রেখে গড়ে তুলবো, না তা আর হয়ে কাজ নাই। আপনিই ওকে নিয়ে যান। কিন্তু আমার এক মাত্র অনুরোধ মেয়েকে এমন শিক্ষা দেবেন যাতে ওর গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ধর্মে মতি হয়। আমার বৌমা'কে আমার শ্বশুর মহাশয়ের বংশের উপযুক্ত বধু প্রস্তুত করে দেওয়া চাই, কিন্তু। দেখলে কত বুদ্ধি রাখেন তিনি, কত সহজে আমার উপর এই দায়িত্ব ভার চড়ালেন। আমি ভাই তার কাঁদ কাঁদ মুখের অনুরোধ ও তার সুবিবেচনার জন্য তাঁর নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, তা স্বীকার করছি।

এখন আরও একটা কথা বলি শোন, ঐ ছোট বয়সে মেয়ের বিবাহ দিয়ে উপরন্তু আবার চন্দরদের বৈষয়িক দুর্ঘটনার কথা শুনে আমি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মা কিন্তু তখনও জোরের সহিত বলতেন—শ্যাম, আমার কথা মনে রাখিস ইন্দুকে আমি সৎপাত্রের হাতেই দিয়েছি। তোমাদের সহায়তায় চন্দর আজ ত সব ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলো। আমার মার অশীর্বাদ ত সফল হলো, ভাই।

মিত্তির মহাশয় তখন গদ গদ ভাবে বলিলেন—পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী মাতা, মার আশীর্বাদ কখন কি নিষ্ফল হতে পারে ভায়া।

৫৫

রেঙ্গুনে আসিবার পর হইতে একমাত্র মার সঙ্গে ভিন্ন আর কোন আত্মীয় স্বজনের সহিত চিঠি পত্রাদির দ্বারা পর্য্যন্ত চন্দ্রবাবুর কোন যোগা-যোগ ছিল না। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তিনি মাতাকে জানাইয়াছেন। মা শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদ ও আশীর্বাদ জানাইয়া পুত্রকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

প্রায় ছয় মাস হইতে চন্দ্রবাবু কাশীতে যাইয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত আছেন কিন্তু উপর্য্যুপরি নূতন নূতন কাজ পাওয়ায়, সময় অভাবে, তিনি এতাবৎ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নিয়মিত প্রতি রবিবারে চন্দ্রবাবু মাকে পত্র লিখিতেন ও নিজ হস্তে বড় ডাকঘরে তাহা পোষ্ট করিতেন। চন্দ্রবাবুর মাতা, উত্তম বাংলা লেখা পড়া জানিতেন। তাঁহার পত্রও প্রতি সপ্তাহে যথা সময়ে পাওয়া যাইত।

এবার দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মাতার কোন পত্রাদি পাওয়া গেল না। সকলের দুশ্চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল। তৃতীয় সপ্তাহে চন্দর

বাবুর নিকট টেলিগ্রামে খবর আসিল—"মাতা অত্যন্ত পীড়িত তোমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।"

এই সংবাদে চন্দ্রবাবু অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রভা কিন্তু ধৈর্য সহকারে তাঁহাকে অনেক সাহস ও সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

প্রথমেই মিত্র মহাশয়কে জানান হইল। তিনি দুঃখ জানাইয়া বলিলেন—চন্দর তা হলে তুমি কালকের মেলেই যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমার সমস্ত কাজেরই ব্যবস্থা করে দেবো। তোমার আপাস্বামীও এখন অনেকটা কাজকর্ম বুঝে নিয়েছে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে মনে হচ্ছে।

চন্দ্র—এত শীঘ্র জাহাজের প্যাসেজ কি পাওয়া যাবে, কাকা বাবু?

মিত্র—আমি চেষ্টা করলে খুব সম্ভব পাওয়া যেতে পারবে।

মিত্র মশাইর সম্মুখে প্রভা চন্দ্রবাবুর সহিত কথা কহিত না, তাই সে তাঁহাকে জনান্তিকে ডাকাইয়া বলিল—কাকাবাবু একটা আপার ডেক্ কেবিন বুক করা চাইত।

অন্য সময় হইলে ইহা শুনিয়া চন্দ্রবাবু হয়ত বলিতেন—এ স্ত্রীলোক গুলো সর্বদা ইকনমিক্সে ভুল করে, বলত একটা গোটা কেবিনের কি দরকার, চারখানা টিকিট ত লাগবে, কিন্তু চন্দ্রবাবু এত মাতৃগত প্রাণ সন্তান যে আজ বিদেশে পরের ঘরে মাতার অসুস্থ ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁর জীবনের প্রধান সাধনা ইকনমিক্স পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন, পিতার মূর্তি ও কীর্তি কিছুই তাঁহার মনে পড়ে না। একমাত্র মাতা, যাঁহার কোলে তিনি মানুষ হইয়াছেন, তিনিই তাঁর এক যোগে মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু এবং শিক্ষয়িত্রী। চন্দ্র ভাবিতেছেন—আমি মার একমাত্র সন্তান এই সন্তানকে তিনি আজ দীর্ঘ চার বৎসর চোখে দেখিতে পর্যন্ত পান নাই, ইহাই কি তাঁর শরীর

ভাঙিবার প্রধান কারণ নয়? কি পাপিষ্ঠ আমি ছি, ছি! আর কি জীবিত দেখতে পাব আমার সেই মাকে?

মিঃ মিত্র প্রশ্ন করিলেন—একটা পুরা কেবিন কি দরকার, মা?

—আমাকেও ত সঙ্গে যেতে হবে, কাকাবাবু, দেখছেন না উনি কি রকম কাতর হয়ে পড়েছেন ওঁকে এই লম্বা জার্ণিতে দেখবে কে? তা ছাড়া সেখানে আমাকেই প্রথমে দরকার হবে, বাবার কাছে শুনেছেন ত আমি সেণ্টজেভিয়ারস থেকে নার্সিংএ ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলাম।

মিঃ মিত্র। ঠিক কথা মা, আমার ওটা মনে হয় নি। তুমি এদিককার সব আয়োজন কর, আমি জাহাজের প্যাসেজ্ বুক করতে চললাম।

৫৬

একাদিক্রমে তিন দিন তিন রাত্রি দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিবার পর চতুর্থ দিন বেলা আড়াইটার সময় হাওড়া স্টেসন হইতে বেনারস এক্সপ্রেস টেনে চন্দ্রবাবু সস্ত্রীক কাশী যাত্রা করিলেন। টমাস কুক্ কোং ইতিপূর্বে এই ট্রেনে মিঃ ও মিসেস রায়ের জন্য দুটি বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন—বাকি নিচের বেঞ্চি খানিতে একটি স্থূলকায় গৌর বর্ণ সৌম্য মূর্তি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। মাথার সম্মুখ দিকের কতকটা মসৃণ টাক, পশ্চাৎ ভাগে একটি ছোট মাপের আধুনিক টিকি, লম্বা সাদা দাড়ী।

অপর পার্শ্বের আপার বাংকে কোন যাত্রী নাই কিন্তু রিজার্ভ টিকিট আঁটা আছে "ডাক্তার পি চাটার্জী"। গাড়ি ছাড়িল কিন্তু ডাঃ চাটার্জীর তখনও দেখা নাই।

নব্য সম্প্রদায়রা কাহাকেও সহজে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে

পছন্দ করেন না, তাঁরা ইহা সভ্যতা-রীতি বিরুদ্ধ বিবেচনা করেন, বৃদ্ধেরা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি প্রথমেই চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন কতদুর যাওয়া হবে আপনাদের ?

চন্দ্র—কাশী

বৃদ্ধ—বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি, এই কি প্রথম ?

চন্দ্র—আজ্ঞে না এই দ্বিতীয়বার, পূর্বে একবার ওখানে গিয়ে দুদিন মাত্র ছিলাম। সেখানে আমার মা অত্যন্ত পীড়িত টেলিগ্রাম পেয়ে যাচ্ছি, তাঁকে দেখতে পাব কি না জানি না, বলিতে বলিতে চন্দ্রবাবুর চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, পরে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া প্রশান্ত মুখে বলিলেন—অদূর ভবিষ্যতে মাতৃহীন হবার কোন চিহ্ন ত তোমার মুখে দেখছি না, বাবা।

চন্দ্র। আপনার আশীর্বাদে আপনার কথাই যেন সত্য হয়।

সযত্নে চন্দ্রবাবুর হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—হাঁ তোমার নিকট আত্মীয়ের পীড়ার লক্ষণ আছে বটে কিন্তু মৃত্যু নাই। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় তোমার মাতা আরোগ্য লাভ করবেন।

উৎসাহিত চন্দ্র তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিলেন, প্রভাও স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

বৃদ্ধ। সৌভাগ্যবতী হও মা।

ট্রেণ ব্যাণ্ডেলে পৌছাইলে একজন সুদর্শন যুবা, চন্দ্রবাবুর সমবয়স্ক হইবেন, ব্যস্তভাবে কামরায় প্রবেশ করিলেন। নিজ নামের রিজার্ভ টিকেট দেখিয়া কুলিকে হুকুম করিলেন—"এহি কামরামে সামান (মাল,) উঠাও।"

মালপত্র গুছাইয়া লইয়া বসিবামাত্র বৃদ্ধের দিকে নজর পড়ায়

ডাক্তার চাটার্জী সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক বলিলেন—এই যে গাঙ্গুলী মশাই, ফিরছেন বুঝি, কবে আসা হয়ে ছিল ?

—সাতদিন কলকাতায় ছিলাম। অসিতের বিবাহ উপলক্ষে আসতে হয়েছিল, অসিত নিজে লিখেছিল—কাকাবাবু আমার বিবাহে আপনাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। বাবা চলে গিয়েছেন কিন্তু আপনি আছেন, আপনি এ কাজে উপস্থিত না থাকলে আমি নিজে কি আমার বিবাহের বরকর্তার কাজ করব ? কাজেই আসতে হল।

—অসিতের বিবাহ কোথায় হল গাঙ্গুলী মশাই ?

উত্তরপাড়ার রাজবাড়ীতে।

—অসিত এখন কোথায় পোষ্টেড্ হয়েছে ?

—বিলেত থেকে ফিরে সোজা সে নৌসেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে পোষ্ট পায়, কিছুদিন হলো কলিকাতা ফোর্টে বদলি হয়েছে! আচ্ছা পুলিন তুমি এ ষ্টেসনে কোথা থেকে উঠলে, কৈ শ্রীরামপুরে ত তোমায় উঠতে দেখলাম না ?

—আজ্ঞে চুঁচড়োয় আমার শ্বশুরবাড়ী, এখন সেইখান থেকেই আসছি এ গাড়িত শ্রীরামপুরে থামে না।

চন্দ্রবাবু এতক্ষণ ডাক্তারের পানে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদের আলাপ শুনিতে ছিলেন। ডাক্তারকে তাঁহার যেন চেনালোক বলিয়া মনে হইতেছিল, কিন্তু লোকটাকে কোথায় দেখিয়াছেন তাহার ঠিকানা করিতে পারিতে ছিলেন না।

যখনই শুনলেন "পুলিন" আর "শ্রীরামপুর" তখনই মনে পড়িল—এ আমাদের হিন্দু হষ্টেলের সেই পুলিন চাটুয্যে না হয়ে যায় না, আরও মনে পড়িল সে তখন ডাক্তারী পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল্ও বটে।

তাহাদের কথার ফাঁকে চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ডাক্তার সাহেব, আমাকে কি চিন্তে পারছেন ? ডাক্তার মনযোগের সহিত অনেকক্ষণ

তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর—মাপ করবেন, আপনাকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে ত মনে করতে পারছি না।

আচ্ছা হিন্দুহষ্টেল, মোহিনী দত্ত, চন্দর রায়, বরেন ঘোস, আশু পাঁড়ে পুলিন চাটুয্যে কাকেও এদের মনে পড়ছে কি ?

আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিবার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন এবার বোধ হয় চিন্তে পেরেছি, তুমি আমাদের সেই স্পোর্টীং চ্যামপিয়ান চন্দর, কেমন নয়, কিন্তু কি পরিবর্তন, পরিচয় না দিলে কার সাধ্য চিনতে পারে ?

—পরিবর্তনটা কোন দিকে দেখছ, ভালর না মন্দর দিকে ?

—বাই জোভ ! মন্দর দিকেত নয়ই, এমন নিখুঁত খোদাই করা চেহারা খানা বাগালে কি করে হে ? ছেলে বয়সে ত তুমি পাতলা রকমেরই ছিলে। তারপর এখন কি করছ, কোথায় আছ, ব্যাঙ্কের জমার খাতে পাঁচ অঙ্ক ছাড়িয়ে গেল নাকি ?

—আরে না না টাকা কি পথের ধুলো হে ? থাকি রেঙ্গুনে, আর সামান্য একটু মাটি কাটার কণ্ট্রাকটারি করি ভাই।

—যাক ওকথা, এখন যাওয়া হচ্ছে কতদূর ?

—বেনারস, আমার মার খুব অসুখ তার পেয়ে, কাশীতে তাঁকে দেখতে চলেছি। তুমি কাশীতে যাচ্ছ নাকি ?

—হাঁ, আমি কাশীর মাড়োয়ারি হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসার, প্রায় দু'বছর ঐ কাযে আছি।

—এটা দেখছি বড় সুলক্ষণ, পথে তোমার সংগে দেখা হয়ে গেল, বোধ হয় মার চিকিৎসা সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ পেতে পারব, আমি ভাই ওখানকার কিছুই জানি না।

—সেকি কথা চন্দর, আমার যতদূর সাধ্য তা তুমি আমার কাছ থেকে পাবার আশা করতে পার। কোন সংকোচ করো না ভাই, তোমার মা আমারও মা, এটা বিশ্বাস করো।

ডাক্তার চন্দ্রবাবুর কানের নিকট মুখ লইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সংগে এই ভদ্র মহিলাটি কে হে ?

চন্দ্র। মিসেস্ রায় আমার অভিভাবিকা, গভর্নে‌স্ বলতে পার। পরে, নিজেকে দেখাইয়া, এই ভ্যাড়াটিকে চরানো ওঁর পেশা।

ডাক্তার হাসি চাপিয়া সেই ভাবেই বলিলেন—যা তা ভ্যাড়া নয় বাবা, পিওর গ্র্যামফেড! গাঙ্গুলী মশাই বলিলেন—পুলিন তোমরা দুজনে বুঝি বাল্য বন্ধু ?

—আজ্ঞে হাঁ, অনেক দিন পর দেখা, চিনতেই পারি নি।

গাঙ্গুলী মশাই—অমন অনেক সময় হয়ে থাকে, চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার মা কাশীতে কোন ঠিকানায় আছেন, বাবাজী ?

—তিনি কেদারে আমার মেসোমশাই সুনীল ঘোষের বাড়ীতে আছেন!

—বটে সুনীল বাবু যে আমার সহকর্মী, আমরা কলেজে দুজনেই এক সময়ে প্রফেসারী করতাম। জানি তাঁর বাড়ী, কাল গঙ্গাস্নানের পর তোমার মাকে দেখে আসব, বাপু।

—আপনার দয়া, আসবেন দয়া করে গাঙ্গুলী মশাই।

ডাঃ। ওহে চন্দর তুমি বোধ হয় ওঁর পরিচয় জান না, উনি আগরা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। জ্যোতিষে ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, অনেক জ্যোতিষী তাঁদের গণনার বিচার করবার জন্য ও উপদেশ নিতে ওঁর কাছে আসেন। হোমিওপ্যাথিতে উনি একজন বিশেষজ্ঞ।

গাঙ্গুলী মশাই মৃদু হাসিয়া কহিলেন—হাঁ বাপু নিজের জীবিকা ছাড়া ও দুটো হবি, (বাতিক) অল্প বয়স থেকেই আছে আমার। এখন অবসর নিয়ে ঐ চর্চ্চাতেই সময় কাটিয়ে থাকি!

৫৭

প্রাতে সুনীল বাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মাতার শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দর্শনে চন্দ্রবাবু অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন। বড় উকিলের কন্যা,, জমিদারের গৃহিণী উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে আজ অবসন্ন, মরণোন্মুখ। মার সেই সযত্ন পালিত সাদা থোড়ের মত সুন্দর পুষ্ট দেহ রোগ পাণ্ডু, শুষ্ক লতার মত লুটাইতেছে। শয্যা মলিন এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি রোগীর ঘরের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। রোগিনীর অজ্ঞান অবস্থা।

ক্ষণপূর্ব পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁহার জ্ঞান ছিল, আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া প্রতি মুহূর্তে তিনি যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, হায়, এখন তাঁহার সেই সন্তানের উপস্থিতিটুকু অবধি তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না!

ধীর সহিষ্ণু প্রভার কিন্তু কোন কাতরভাব প্রকাশিত হইল না। সে স্থির ভাবে মাসীমা ও মেসো মহাশয়কে প্রণাম ও তাঁহাদের পদধুলি গ্রহণ করিল। ধীরতার সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল—মার এ অবস্থা কতদিন হয়েছে মাসিমা ?

—পরশু সকালে পর্যন্ত জ্ঞান ছিল মা, হ'ল কী জান মা, তার আগে সমস্ত দিনে আমি ওকে একবিন্দু জল পর্যন্ত মুখে দেওয়াতে পারলুম না। ঝোঁক ধরলে—আজ আমার খোকা আসবে তারে খবর এসেছে, সে এলে তবে আমি খাব। কত বোঝালুম দাঁতে দাঁত চেপে রইল। আগে দশ বার দিন খুব জোর জ্বর আসত বটে কিন্তু জ্বর কমে গেলে কথাটা আসটা কইত, ওর কথা আর কী মা, কেবল খোকার কথা। এবার প্রভা চোখের জল সামলাইতে পারিল না, অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

আর অধিক কথায় সময় নষ্ট না করিয়া প্রভা তৎক্ষণাৎ রোগীর ঘর

সংস্কার কার্যে লাগিয়া গেল। মাসিমা বলিলেন—এখনই একি করছ মা, পাঁচদিন ক্রমাগত পথে পথে এসেছ একটু জিরিয়ে নাও, পরে যা হয় করো।

—না মাসিমা, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা চলবে না। পথে আমাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি।

চন্দ্রবাবু কোন কাজে হাত লাগাইতে পারিলেন না, স্থানুর ন্যায় মাতার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, আর কোথাও না, কেবল মাত্র মার ভাল মন্দের নিকট, সর্বকার্যে এই পাকা চৌকস লোকটির দুর্বলতা দেখা গেল।

ইতিমধ্যে পুলিন ডাক্তারের ছোট ভাই বিপিনবিহারী হাঁসপাতালের দুইজন বেহারাকে লইয়া চন্দ্রবাবুর সাহায্যে উপস্থিত হইলেন। বেহারাদের সাহায্যে প্রভা এক ঘণ্টার মধ্যে ঘরের আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। বিপিনবাবুর দ্বারা নুতন পরিষ্কার বিছানা কিনিয়া আনান হইল। শুশ্রূষার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির একটি ফর্দ পাঠাইয়া প্রভা ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং সেগুলি যথাযথ স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া তবে স্নান করিতে গেল।

বেলা এগারটার সময় ডাঃ চ্যাটার্জী ও গাঙ্গুলী মশাই সিভিল সার্জনকে সংগে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সযত্নে বহুক্ষণ ধরিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিবার পর তাঁহারা তিনজনেই একমত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে—রোগ সেরূপ কঠিন নয় কিন্তু বর্তমান দুর্বলতা অতি শীঘ্র দূর করিতে না পারিলে জীবনী শক্তির অভাবে হঠাৎ তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

সিভিল সার্জন C. G. Injection (সি জি ইন্‌জেকসনের) ব্যবস্থা দিয়া গেলেন এবং আশা দিয়া গেলেনযে—সম্ভবতঃ দুই তিনবার ইন্‌জেকসন হইবার পর রোগিণীর শরীরে বল ও চেতনা ফিরিয়া আসিতে পারে, তখন উপযুক্ত ঔষধ পথ্য দিয়া ইহাকে আরোগ্যের পথে আনা সহজ হইবে।

ইহাতে যদ্যপি সুফল না পাওয়া যায় তবে রোগিণীর শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা আবশ্যক হইতে পারে অতএব তাহার জন্য লোক ঠিক রাখিলে ভাল হয়। তখন চন্দ্রবাবু নিজের সুন্দর বলপুষ্ট দক্ষিণ হস্তখানি উঠাইয়া দেখাইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন—দ্যাটস্ অলরাইট, ঠিক হ্যায়।

বেলা বারোটায় ও রাত্রি বারোটায় দুইবার ইন্‌জেকসন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ, গঙ্গার পরপারে পূর্বকূলে উষার আলোক অল্প মাত্রায় প্রতিভাত হইতেছে, খোলা জানলার ফাঁক দিয়া প্রভা তাহা একবার দেখিয়া লইল। ক্রমে শুনা যাইতে লাগিল কাশীর অসংখ্য মন্দিরে মঙ্গল আরতির বাদ্যধ্বনি। আলো একটু স্পষ্ট হইলে প্রভা রোগিনীর চেতনা লক্ষণ বেশ বুঝিতে পারিল।

অল্পক্ষণ পরে মা চক্ষু চাহিলেন, তাঁহার ঠোট অল্প নড়িয়া উঠিল। শিক্ষিতা নার্স প্রভা, তৎপর হইয়া তাঁহার মুখের নিকট কান পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী বলছেন মা? অতি ক্ষীণ ও জড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল—কে তুমি? তুমি কি আমার হারানো মা, স্বর্গ থেকে আমায় নিতে এসেছ? ঠিক সেই চেহারা। আমি সমস্ত রাত তোমায় স্বপ্ন দেখছিলাম, এখনও কী স্বপ্ন দেখছি?

—না মা, আপনি আর স্বপ্ন দেখছেন না, চাক্ষুষ দেখছেন।

মাতা স্বগত—তবে কী, তবে কী? কী মিষ্টি কথা, এত সুন্দর ত সে নয়, তবে কে এই লক্ষ্মী প্রতিমা?

"মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন—অচেতন অবস্থা হইতে মানুষের শরীরে যখন চেতনার উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয় তখন তাহার দুর্বল মস্তিষ্ক একপ্রকার স্বপ্ন জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, নানা সংলগ্ন অসংলগ্ন স্বপ্ন চলিতে থাকে"। সারা রাত্রি চন্দ্রের মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছেন—তাঁহার মৃতা মাতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নিরন্তর সেবা করিতেছেন

এবং তাঁহার সুন্দর মমতাময়ী মাতৃমুখে করুণা-জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছে।

প্রভা অতি সন্তর্পণে উঠিয়া রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিল। একটি পাত্রে ঔষধ ঢালিয়া লইয়া বলিল—এই অষুধটুকু খেয়ে নিয়ে আরও কিছু জিরিয়ে নিন্ মা। মাতা অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া ঠোট চাপিয়া রহিলেন।

প্রভা পূর্ব বৃত্তান্ত জানিত, না খাইবার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিল জিজ্ঞাসা করিল খাবেন না কেন মা? আপনার খোকা এসে যদি খাইয়ে দেন তবেই ত খাবেন?

—হাঁ।

—বেশ, এখনই যদি আমি আপনার খোকাকে আপনার সামনে আনতে পারি তা হ'লে এরপর আমার সকল কথা লক্ষী হ'য়ে শুনবেন ত?

—হাঁ নিশ্চয়।

—ঔষধের পাত্র লইয়া চন্দ্রবাবু মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে গিয়া উত্তেজনা বশতঃ তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, পার্শ্বস্থা সতর্ক প্রভা তাঁহার নিকট হইতে ঔষধের পাত্রটি লইয়া ক্ষিপ্র ও নিপুণ হস্তে মাকে ঔষধ সেবন করাইয়া দিল, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল —"এইত লক্ষী মেয়ের মতন।"

এইবার মা বোধ হয় নিজ পুত্রবধুকে চিনিতে পারিলেন, আনন্দে তাঁহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি মনে মনে বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন—দীর্ঘজীবী কর, ইহার দ্বারা যেন আমার শ্বশুর বংশের শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হয়।

চন্দ্রের মাতা দিন দিন অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর কপোলে আবার রক্তের আভা দেখা দিতে

লাগিল। দশ দিনের মধ্যে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন।

এই সময় মাতা ও পুত্রে সমস্ত দিন একত্রে বসিয়া নিজ নিজ রেঙ্গুন ও কাশী বাসের গল্পের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। এ কয়েক দিন মাতার সান্নিধ্য হইতে চন্দ্রবাবুকে এক দণ্ডের জন্যও বাড়ীর বাহিরে সরাইতে পারা যায় নাই।

প্রভা অধিকাংশ সময় প্রফুল্লমনে শ্বশ্রু ও স্বামীর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। মধ্যাহ্নে মা ও মাসিমা কে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইত, কোন কোন দিন সুনীল বাবু আসিয়া প্রভার পাঠ শুনিতেন, তাহার মধুর স্বর, সংযত আবৃত্তি শুনিয়া প্রৌঢ়েরা এতদূর মোহিত হইয়া পড়িতেন যে কোন আবশ্যকীয় কার্যানুরোধেও তাঁহাকে পাঠ বন্ধ করিতে দিতে চাহিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন গাঙ্গুলী মশাই চন্দ্রবাবুর মাতাকে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরীক্ষা বা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ; কেবলমাত্র চোখে দেখিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন—আপনার আর ওষুধের আবশ্যক হ'বে না মা, পরে চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐযে আপনার প্রধান ওষুধ আপনার সামনেই বসে আছেন।

৫৮

দুই সপ্তা'হ পরে মা সম্পূর্ণ বল পাইয়াছেন দেখিয়া চন্দ্রবাবুর নিত্য সাধনা ও সহচর ইকনমিক্স আবার আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি কাশীর চক ও বাজারে ঐ প্রদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতল কাঁসার ও সাদাধাতুর বাসন এবং বিশেষ করিয়া

বেনারসী কাপড়ের কুটীর শিল্পের সুকুমার কলা ও ব্যবসার ক্রম বিস্তার তাঁহার মনযোগ আকৃষ্ট করিল।

চন্দ্রবাবু ডাক্তার চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁ হে তোমাদের এখানে এই যে এত বড় বেনারসী কাপড়ের কাজ বহুদিন হ'তে চলে আসছে এর কারখানা তুমি কখন দেখেছ?

—না ভাই চন্দর।

—আচ্ছা যারা এই কাপড় তৈয়ার করে, যারা এর ব্যবসা করে, তাদের মধ্যে কারুর সংগে তোমার আলাপ পরিচয় আছে?

—অনেকের কাছেই আমার খুব খাতির আছে, তাঁতীরা ত প্রত্যহ হাঁসপাতালে ওষুধ নিতে আসে, তাদের মহল্লার অধিকাংশ লোক আমার পরিচিত। আমার ভাই বিপিনকে ও তারা খুব চেনে ও খাতির করে, তুমি তাকে সংগে করে নিয়ে গেলে সমস্ত দেখে শুনে আসতে পারবে। আর কোন বিশেষ খবর জানতে চাইলে আমি তোমায় জগন্নাথ প্রসাদ কাশীনাথ দের প্রধান অংশিদার স্বরূপচাঁদ বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারি, আমি তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক।

পরদিন হইতেই বিপিন বাবুর সহিত তাঁতীদের মহল্লায় গিয়া চন্দ্রবাবু কাশীর কাপড়ের প্রস্তুতি, মেরামতি, ধোলাই, প্যাকিং প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে চলতি ও নূতন ডিজাইনের ও নানাবিধ মাপের প্রায় তিন হাজার টাকা মূল্যের ঐ কাপড় খরিদ করিবার ও সরাসরি রেঙ্গুনে পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভবিষ্যতে এই কাযের জন্য এখানকার অন্যতম প্রধান ব্যাপারী উক্ত জগন্নাথ প্রসাদ কাশীনাথ দের এজেন্ট নিযুক্ত করিলেন।

বিপিন বাবুকে কহিলেন—ভাই বিপিন তুমি কালেক্টরিতে মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি করছ, ভবিষ্যত উন্নতির বিশেষ কোন আশা নেই। আমি এই কাপড়ের ব্যবসার যে সব সন্ধান নিলাম,

আমার সংগে থেকে তুমি সে সকল ত জানতে পারলে। তোমার দাদা ও তোমার কাছ থেকে এখানে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। এখন আমাকে তোমাদের জন্য কিছু করতে দাও।

চন্দ্রবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—চাকরির পরও তোমার অনেক সময় ও অবসর আছে দেখছি। যদি ইচ্ছাকর ঐ অবসর সময়টুকু বৃথা নষ্ট না করে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তুমি আমার এজেন্টদের সহিত একযোগে এই কাজটি দেখ। এতে তোমার কাজ শেখাও হবে চাই কি একদিন তুমি নিজেই একজন ব্যাপারী হয়ে দাঁড়াতে পারবে। এখন তোমার কাজ হবে দেখা যাতে, আমি রেঙ্গুন থেকে যে সব মালের অর্ডার পাঠাব সেগুলি ঠিকমত তৈয়ার হয়, ভাল রকম প্যাকিং ও যথাসময়ে পাঠান হয়। এই সমস্ত কাজে কোন পক্ষে যেন কোন ত্রুটী না হয় এইটি হবে তোমার প্রধান কাজ। মাল প্যাক হবার পূর্বে তুমি সমস্ত চেক করে ঠিক আছে লিখলে তবে আমি এজেন্টের বিল পেমেণ্ট করব, বুঝতে পারলে ?

বিপিন অতি আগ্রহের সহিত চন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে রাজি হইলেন। চন্দ্রবাবু তাঁহাকে আবার বলিতে লাগিলেন—দেখ বিপিনবিহারী আমি ব্যাগারে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাই না, এ বিষয়ে আমার গুরুর নিষেধ আছে। যদি ভগবানের ইচ্ছায় ও আমাদের চেষ্টায় কাজটা চালু হয় তবে এখন হতেই এই কারবারের নিট্ লাভের দু'আনা অংশ তুমি পাবে। মুখের কথা নয় আমি লিখে দিয়ে যাব।

ইহা হইতেই পরবর্তী কালের, চন্দ্রবাবুর বৃহৎ রেশম ও রেশমী কাপড়ের ব্যবসার সুত্রপাত হয়।

৫৯

মাকে রেঙ্গুনে সংগে লইয়া যাইবার জন্য চন্দ্রবাবু ও প্রভা অনেক অনুনয় ও অনুরোধ করিলেন। মাতা উত্তরে কহিলেন—কি যে বলিস বাবু তোরা, আমি এই কাশী বিশ্বেশ্বর ছেড়ে তোদের সেই ম্লেচ্ছের দেশে যাব! মার কথা শুনিয়া উৎসাহ দীপ্ত মুখে চন্দ্র বলিলেন—কী ম্লেচ্ছের দেশ? অমন কথা বল না মা, সেখানে শত শত মন্দিরে প্রতিদিন যেরূপ পূজা পাঠের সুন্দর ব্যবস্থা আছে, পৃথিবীর অতি অল্প জায়গাতে তেমন দেখা যায়। যদি অপরাধ না নাও তবে বলি তোমার বিশ্বনাথ কাশীনাথের রাজ্যেও তেমনটি দেখতে পেলাম না। আমি এবার তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবই। শঙ্কিত চিত্তে মা কহিলেন—তুই নিজের কাজে যা দিকিন এখন, পরে সে কথা হবে।

মা প্রভাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে বসিলেন, অন্যান্য কথার পর তিনি বলিতে লাগিলেন—দেখ্ মা আমি এই খোকার কথাই তোকে বলছি—হাঁ বলছি···তিনি আনমনা হইয়া থামিয়া গেলেন।

প্রভা—কি বলছেন বলুন না মা।

—হাঁ বলব, তোকেই বলবো, আর কাকেও বলতে সাহস হয় না। আমার যা পোড়া অদেষ্ট।

—কি ইচ্ছা আপনার বলুন না আমায়, আমি যে আপনার মা, আমি যে আপনার মেয়ে, আমায় বলতে বাধা কি, মা?

—না তোকে তা হলে বলি। আমার খোকাটি যে কিরূপ জেদী তা এত দিনে বোধ হয় তুই কতকটা বুঝতে পেরেছিস ওদের বংশের ধারাই এই যা ধরবে তা করে তবে ছাড়বে। এই যে ধরেছে আমায় নিয়ে যাবে তখন ওর ঐ মতলব সহজে নড়ান যাবে না। আমার মনের

একান্ত বাসনা—কাশী ছেড়ে আমি কেবলমাত্র আমার শ্বশুরের ভিটায় তাঁর বাস ভবনে গিয়ে থাকতে পারি, যেখানে আমার স্বামী, শ্বশুর ও তাঁদের পিতৃপুরুষ মহাশয়রা কত কীর্তি রেখে তাঁদের জীবনযাত্রা শেষ করে দেহত্যাগ করেছেন, যেখানে আমার শাশুড়ী ও তাঁহার পূর্ববর্তিনী শাশুড়ীরা কত পূণ্য ব্রতনিয়ম পালন করে তাঁদের শেষ নিশ্বাস ও আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

কি বলব আশ্চর্য, এই চার বৎসরের মধ্যে যখনই আমি কাশী-বিশ্বেশ্বরের পূজা ও ধ্যান করবার চেষ্টা করেছি তখনই আমাদের সেই কুল-দেবতা কাশীশ্বর দেবের মূর্তি জ্বলজ্বল করে আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তিনি যে আমার সেবার অপেক্ষা করছেন, প্রভা মা।

তাই বলি—আমাদের সেই পৈত্রিক গ্রাম শত আবর্জনা পূর্ণ হলেও, আমাদের কাছে তা পবিত্র তীর্থস্থান—"সেই আমার বৃদ্ধ বয়সের বারানসী"।

মার আবেগময়ী কথাগুলি শুনিয়া উচ্ছ্বসিত প্রভা বলিল—মা আপনার কথা শুনে এখনই গিয়ে আমাদের সেই শ্বশুর ঘর দেখে আসতে আমার ইচ্ছা করছে, আমি একবার মাত্র অল্প ক'দিনের জন্য সেখানে গেছলাম বটে কিন্তু দশ বছরের কনে বউ কিছুই ভাল করে দেখবার সুযোগ হয় নি। আচ্ছা মা সেখানে যেতে আপনার যদি এত ইচ্ছে, চলুন না রেঙ্গুনে ফেরবার সময় একবার রামচন্দ্রপুরের বাড়ীঘরগুলো দেখে যাই।

—আরে বেটী, সেটা অত সহজ নয়। আমি বড় মনোকষ্টে, লোকের অগোচরে নিঃশব্দে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি, রোস্ আগে তোর ছেলে হোক্ আমার সেই বংশধরকে বুকে করে ডাইনে বাঁয়ে দু'পাশে আমার ছেলে বউকে নিয়ে বাজনা বাদ্যি সমারোহ করে তবে ত আবার গৃহ প্রবেশ করবো। আমি রায় বংশের বউ, শ্বশুর আমার ওদেশের

মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, খোকা আমার সেই বংশের নাম উজ্জ্বল করতে পারবে।

কপট মুখভঙ্গী করিয়া প্রভা কহিল—তবে আমি বুঝি মা রায়েদের বাড়ীর ঝি চাকরাণী, তাঁর কোন কাজে লাগব না ?

—তুই যে তার সহধর্মিণী, তার সকল কাজের অর্ধেক অংশ তোকে নিতে হবে। তুই যে আমার ঘরের লক্ষ্মী আমার মা। মা যেমন নিজের শরীরপাত করে সন্তানের জন্ম দেন তুইও ত নিজের শরীর পাত করে আমায় এবার বাঁচিয়ে তুললি, আমি ত মরেই গেছলাম দু'দিন ধরে জীবনের কোন সাড়া শব্দ ছিল না, তুই ত আমায় নতুন জন্ম দিলি, তুই কি সাধারণ মেয়ে রে ?

—আমায় অতটা আদর দেবেন না, অতটা বাড়াবেন না মা, তা বলে রাখছি। আজই সকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছিলাম তিনি লিখেছেন—"আমরা যখন কোন মেয়েকে বলি অসাধারণ তখন সে সত্যই অসি ধারণ করে বসে, শেষে তাতেই তার পতন হয়"।

—না তোর তা হবে না, এই ক'দিনের মধ্যেই দেখলুম—তোর শিক্ষা দীক্ষা মোটেই সে রকম নয়। তাই আজ তোকে আমার প্রাণের এই গুপ্ত অভিসন্ধি জানাতে সাহস করলুম, বাছা !

এতক্ষণে চুলবাঁধা শেষ করিয়া মাতাঠাকুরাণী বধুর মুখ মুছাইয়া সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। প্রভা উঠিয়া মাকে প্রণাম করিল, মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

৬০

• চন্দ্রবাবুর মাতার অসুখের সময় শ্যামাচরণবাবু প্রতিদিন, কখন চিঠি দ্বারা, কোন দিন টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। বর্তমানে

তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া চন্দ্রকে লিখিলেন—তোমরা যখন এত দূর আসিয়াছ, তখন একবার বম্বেতে আসিয়া আমাদের দেখা দিয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া প্রভার মা তোমাদের দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

কাজেই প্রভাকে লইয়া চন্দ্রবাবুকে কিছু দিনের জন্য বম্বে যাইতে হইল।

বোম্বাইতে থাকার সময় চন্দ্রবাবু প্রতিদিন ১১টার সময় তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের অফিসে যাইতেন, ও সেখানকার কর্ম পদ্ধতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেন। তার মধ্যে যেগুলি মনোমত হইত তাহা আপনার নোট-বুকে টুকিয়া লইতেন।

দু'ঘণ্টা আপিসে থাকিয়া তিনি আপিসের দালাল নানালাল বাবুকে সংগে লইয়া বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বেলা দু'টার পর Pears Resturantএ কিছু হাল্কা টিফিন করিয়া অধিকাংশ দিন ডকের দিকে বেড়াইতে যাইতেন।

এক সপ্তাহ পরে একদিন শ্যামবাবু চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কি গো চন্দ্র, বোম্বাইয়ের বাজার কেমন দেখছ?

—আমরা মশাই পুকুরের মাছ ছোট শহরে কাজ করি, এখানকার সমুদ্রের মত বিশাল বাজারের কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্যামবাবু বলিলেন তা ঠিক, অল্পদিনের মধ্যে এ বিষয়ে একটা ধারণা করা ত সম্ভব নয়, বাপু।

মোটামুটি দেখতে গেলে, এখানকার অর্দ্ধেক ব্যাপারীরা তুলা ও তুলা-জাত দ্রব্য (cotton and cotton textile) নিয়েই ব্যস্ত।

বাকি অর্দ্ধেকের মধ্যে Bullion market, Stock exchange,

Jewellery, Hard ware, Tobacco Paper, Stationary (সোনা-রূপা, কোম্পানির কাগজ ও কারবারের শেয়ার, জহরৎ, লোহা-লক্কড়, তামাক, কাগজ) প্রভৃতির কাজগুলিই প্রধান বোধ হয়।

বহুদিন বোম্বেতে বাস করে ও কাজ কারবার নিয়ে থেকে, আমার এই ধারণা হয়েছে, যে এখানে যে কাজই কর না, তা Big Scaleএ করাই আবশ্যক। কঠিন প্রতিযোগীতায় লাভের অঙ্ক খুব কম হয়ে যাওয়ায়, ছোট কাজে মজুরী পোষায় না চন্দ্র, এ বাজারে।

চন্দ্র—আপনি যা বলেছেন, আমারও কতকটা তাই ধারণা।

শ্যাম—দেখ বাপু তুমি তোমাদের রেঙ্গুনকে আজ ছোট বলছ বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওর ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ। একদিন ঐ রেঙ্গুন বোম্বাই ও কলকাতার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। Stick to your gun, my boy—যে কাজ আরম্ভ করেছ তাতেই মনোযোগ দাও। তাকেই ধরে থাক, নিশ্চয় উন্নতি হবে।

৬১

শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ী ব্যাঙ্কষ্ট্রীটএর বারান্দা হইতে Ballard Pyre—যেখান থেকে বিলাতী মেল যাতায়াত করে—বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

সেদিন বিকালে স্বয়ং কর্তা ও গৃহিনী চার তলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। কর্তা একখানি প্রশস্ত আরাম চেয়ারে উপবিষ্ট মুখে আলবোলার নল।

সামনে গৃহিনী, হেলান দেওয়া একখানি কুশন চেয়ারে বসিয়া আছেন।

কন্যা প্রভা, পিছনে দাঁড়াইয়া ছোট ঝিনুক দিয়া বাপের পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিতেছে।

কিছুক্ষণ আগে বিলাতী মেল জাহাজ পৌছিয়াছে। নানাজাতীয়, নানাবিধ পোষাক পরিহিত যাত্রীরা, দুটি "গ্যাঙ্‌ওয়ে"—সিড়ী দিয়া নামিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ক্লান্ত, কেহ বা দীর্ঘ প্রবাসের পর প্রিয়-মুখ দর্শনে প্রফুল্ল। বহুলোক সেখানে তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিতে জুটিয়াছে।

একদিক দিয়া "মেল ব্যাগ" নামিয়া জেটিতে স্তূপীকৃত হইতেছে। পোটাররা একদিক দিয়া লেবেল আঁটা মাল-পত্র নামাইয়া আনিতেছে।

তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের মত হোটেলের পাণ্ডারা নিজ নিজ হোটেলের নাম ছাপা টুপি পরিয়া যাত্রীদের ঘিরিয়া ফেলিতেছে!

ভারতের পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম সীমান্তগামী ট্রেণগুলি ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উপরে সারি সারি অপেক্ষা করিতেছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বা ঐ সকল গাড়ীতে নিজেদের "সীট" নির্ণয় করিয়া তাহা অধিকার করিতেছে, কেহ বা পাণ্ডাদের সংগে হোটেলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সকলেই ব্যস্ত, সমস্ত মিলিয়া একটা দেখিবার যোগ্য সমারোহ ব্যাপার, দৃশ্যটা উপভোগ্য ও বটে।

পূর্বোক্ত ঘোষ এয়ী—পিতা, মাতা, কন্যা—মধ্যে মধ্যে চোখে বাইন-কুলার লাগাইয়া ঐ জনতা দেখিতেছিলেন।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ চন্দরের এত দেরী কেন? এর অনেক আগে ত সে বাড়ী ফেরে, গেল কোথায়?

কর্তা বলিলেন—যাবে আর কোথায়, মেল ইন হয়েছে সম্ভবতঃ তাই দেখতে গেছে।

লক্ষ্মণ বেহারা আসিয়া খবর দিল—জামাইবাবু এসেছেন। আমি তাঁকে—ছাড়বার কাপড় আর বাথরুমে জল ঠিক করে—দিয়ে এসেছি।

কর্তা হুকুম দিলেন—চন্দরের জল-খাবারের জায়গা এখানেই করে দে লক্ষ্মণ !

কর্তার আদেশ মত লক্ষ্মণ রোজ-উডের এক সেট টিপয় ও চেয়ার আনিয়া, তাহার উপর কাশ্মিরী কাজ করা টেবিল-ঢাকা বিছাইয়া, খাবারের জায়গা করিয়া দিল।

গৃহিণী নিজে উঠিয়া গিয়া, মারাঠি বয় রামার সাহায্যে, খাবারগুলি সাজাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্র আসিতেই শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—এত দেরী কেন, কোথায় গিয়েছিলে, বাবা ? খাবার দাবার গুলো যে সব ঠাণ্ডা হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।

চন্দ্র বলিল—মেল কামিং দেখতে গিয়েছিলাম, মা।

কর্তা বলিয়া উঠিলেন,—দেখলে, আমি তো ঠিক বলেছিলাম ?

চন্দ্র হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ ওটা আমার একটা বাতিক। রেঙ্গুনে বিলাতী মেল যখন আসে—এখানকার সংগে তো তার তুলনাই হয় না।—তবু আমি নিয়মিত জেটীতে হাজিরা দিই। তখন আমার মনে হয়, যেন আমি কোন ইয়োরোপ বা এ্যমেরিকার বন্দরে বেড়াচ্ছি।

কর্তা—তাহলে বল, ও সব জায়গায় যাবার তোমার খুবই ইচ্ছে আছে ?

—আছেই তো।

কর্তা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সে বিষয়ে তোমার ইকনমিক্স কি বলেন গো ?

চন্দ্র একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, কিন্তু উত্তর দিতেও ছাড়িল না, বলিল—যে নতুন কাজগুলি আরম্ভ করেছি আগে সেগুলি জমিয়ে তুলি, আর বুদ্ধিটা আর একটু বাড়িয়ে নিই। তা না হলে সেখানে গিয়ে তো কোন সুবিধে করে উঠতে পারা যাবে না।

—তোমার এ কথাটি খুব সত্য, চন্দ্র। এখান থেকে খাজা এ্যামেচার ছেলেরা সেখানে গিয়ে কিছুই বুঝতে পারে না, কাজেই কিছু শিখে আসতে পারে না। খালি টাকা ও সময় নষ্ট করে আসে।

যে কাজ শিখতে যাবে—তা সে ব্যবসাই হোক আর কারিগরীই হোক—এখান থেকে তার একটা ভিত্তি করে যাওয়া উচিৎ। তবেই না সেটা বুঝতে পারবে।

গৃহিণী নিকটে বসিয়া জামাইয়ের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া বলিলেন—দেখ চন্দ্র, কাজের জন্যে, নিজের উন্নতির জন্যে যেখানেই যাও বাবা আমি তাতে "না" বলব না, কিন্তু অমন নিরুদ্দেশ হয়ে আর থেকো না। যতদিন ভালো করে তোমায় দেখি নি, তখন যা'হোক এক রকম করে চলে গেছে। এখন কিন্তু এক দণ্ড ও চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। তোমার খবর পেতে দেরী হলে আমি হাঁপিয়ে মরে যাব।

চন্দ্র—না মা, আমি আর সে কাজ করব না। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমার জন্যে ভেবে ভেবে, আমার মা তো মরতে বসেছিলেন, দেখলেন তো।

কর্তা বলিলেন—আমি তা হলে এখন উঠি। শিববাবুর বাড়ীতে আবার একটা পার্টি আছে, তৈরী হতে হবে। গৃহিণী উঠিবার সময় প্রভাকে বলিয়া গেলেন,—তুই মা চন্দ্রকে একটু কোকো করে দিস, হ্যাঁ চন্দ্র, তুমি তো এই সময় কোকোই খাও ?

—হ্যাঁ মা, কোকোই হোক।

গৃহিণী চলিয়া গেলে, লক্ষণ, গরম জল প্রভৃতি গুছাইয়া দিয়া গেল। প্রভা উঠিয়া কোকো প্রস্তুত করিতে লাগিল। চন্দ্রকে একলা পাইয়া, প্রভা জিজ্ঞাসা করিল—মৎলবখানা কি ঠিক করে বলত ?

—বসে বসে সব শুনলে তো, আচ্ছা শোন আসল মৎলবটা তোমায়

খুলেই বলি, যদি কাজ-কর্ম গুছিয়ে তুলতে পারি, তবে ও দেশগুলতে একবার ঘুরে আসবার ইচ্ছে আছে। তবে এবার আর একলা নয়, সস্ত্রীক।

অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত প্রভা বলিল,—বল কি গো! আমার মত একটা বোঝা তোমার ভার লাগবে না?

—একেবারেই না, তুমি ভার কিসে? আমার চেয়ে তুমিই তো ওদেশের "এটিকেট" (কায়দা-কানুন) ভালো জান, ভালো ইংরেজিও বল্‌তে পারো, তোমার মত স্ত্রীই তো সংগে যাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

রেঙ্গুন থেকে কাশী আসবার সময় যেমন হয়েছিল—আমাকেই তুমি বরঞ্চ তোয়াজ করে নিয়ে যেতে পারবে।

—কেন আমি কি তোমার "ভ্যালেট" না "বাটলার", যে তোমায় তোয়াজ করে বেড়াব?

—ওগো না, বাটলার কেন হতে যাবে। তুমি হচ্ছ মহাকবি কালিদাসের ভাষায়—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"

অর্থাৎ তুমি একাধারে আমার গৃহিণী, সচিব, নর্ম সহচরী এবং কলা বিদ্যায় প্রিয়শিষ্যা। তুমি সংগে যাবে না তো যাবে কে?

আহ্লাদের আতিশয্যে উজ্জল রাঙা মুখ লইয়া প্রভা ঘরের ভিতর হইতে অতি সুন্দর এক ছড়া ফুলের মালা আনিয়া স্বামীর গলায় দোলাইয়া দিল।

চন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে সুধালেন—এ আবার কি রাণী, ব্যাপার কি?

প্রভারাণী সেই ভাবেই উত্তর করিল—তোমার আজকার শুভ পরিকল্পনার জন্য অভিনন্দন, মশাই।

কিছু পূর্বে হরিহর জহুরীর বিবাহ বাড়ী হইতে আসিয়াছিল এই

মালা। প্রভা যথাসময়ে তাই এই মালাগাছটি হাতের কাছে পাইয়া গেল।

একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্যামবাবু চন্দ্রকে বলিলেন—ওগো চন্দর আমাকেও বোধ হয় রেঙ্গুন পর্য্যন্ত তোমাদের সংগী হ'তে হয়। চন্দ্রবাবু কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শ্যামবাবু পুনরায় কহিতে লাগিলেন—আজ রেঙ্গুন থেকে ন্যাসানাল ব্যাঙ্ক তার করে'ছে যে—আমার ওখানকার এজেণ্ট সিরাজী সাহেব মারা গিয়েছেন। ঐ ব্যাঙ্কের উপর সিরাজীর নামে আমার মোটা টাকার লেটার অফ ক্রেডিট দেওয়া আছে, এখন ব্যাঙ্ক জানতে চাইছে—কার সই স্বাক্ষর নিয়ে তারা টাকা পেমেণ্ট কর'বে?

চন্দ্র—কি ব্যবস্থা করলেন?

শ্যাম—এখনও কিছু জবাব দেওয়া হয়নি, ভেবে দেখচি—সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে অবস্থা দেখে ও অপর খবরাখবর নিয়ে তবে ব্যবস্থা করাই উচিত।

—তা হলেই ভাল হয়, আমরাও কিছুদিন আপনার সেবা করতে পাই।

মৃদু হাসিয়া শ্যামবাবু কহিলেন—কাল তা হলে সেই কথাই টেলিগ্রাফ করে দেওয়া যাক, কি বল?

৬২

দুই মাস অনুপস্থিতির পর এক সপ্তাহ হইল চন্দ্রবাবু পুনরায় রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাশীকৃত কাজ, তাঁহার আগমনের অপেক্ষায়

ছিল এই হেতু তিনি এ কয়দিন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। ঘরকন্না এখনও পর্যন্ত রীতিমত পরিষ্কার ও গোছান হয় নাই, বিশেষতঃ তাঁরা কাশী ও বম্বাই হইতে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর ছবি ও শৌখিন জিনিসগুলি আনিয়াছেন, তাহা যথাযথ স্থানে সাজান হয় নাই।

এদিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আসিয়া পড়িয়াছে, ঘর দুয়ার সাজাইয়া কাল দাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইবে, প্রভা একলা সমস্ত গুছাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। চন্দ্রবাবু প্রভাকে বলিয়া দিলেন—তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না, স্বসাকে ডেকে পাঠাও, সে এসে খুব সহজেই সব ঠিক করে দিতে পারবে। দেখা গেছে এ সব কাজে সে বেশ পাকা।

চন্দ্রবাবুর শ্বশুর মহাশয় তাঁহাদের সহিত রেঙ্গুনে আসিয়াছেন ও তাঁহার পুরাতন বন্ধু শঙ্কর বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্র কিম্বা প্রভা কেহই তাঁহাকে নিজেদের বাটীতে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস পান নাই, পাছে তাহাতে মিত্র মহাশয়ের অপমান করা হয়।

আজ চন্দ্রবাবু সকাল সাতটায় কাজে বাহির হইয়া প্রায় বেলা দু'টার সময় ফিরিয়া, আহারাদির পর, ভিতর দিকের ঘেরা বারান্দায় খালি মেঝেতে একটি তাকিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন এবং অদ্যকার মেলে আমদানি সাপ্তাহিক "ইলাসট্রেটেড্ লণ্ডন নিউস" পত্রিকার পাতা উলটাইতে ছিলেন।

সুষমা প্রভার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঘাড়টি বাঁদিকে ঈষৎ হেলাইয়া, ঠোঁটে একটু মধুর হাসি ফুটাইয়া, যাদুকরী ভঙ্গীতে বলিলেন—কি গো বৌদি ইন্দুপ্রভা,—অর্থাৎ কিনা চন্দ্রকিরণ—কিনা জ্যোৎস্না, আমার দাদার ঘর আলো করে যে বসে আছ?

—এস এস পণ্ডিতা রমাবাই, এস স্বাগত, শোভনা-সুষমা, এস আমার ননদিনী।

—না রায় বাঘিনী।

—না না তা নয়, আদরিণী, মাথার মণি।

—তারপর ডেকে পাঠিয়েছ কেন বলত, ফারমাইয়ে?

—প্রভা হাসি মুখে কহিলেন—আরে ভাই আজ ক'দিন থেকে বাইরের হলঘরটা কিছুতেই মনের মত করে সাজিয়ে উঠতে পারছি না, কেবল নাড়ানাড়ি করেই মরছি। তোমার দাদা দেখে বলে দিলেন—ডাক আমার বোনকে সে আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করে দিয়ে যাবে।

—কোথায় দাদা?

—ঐ যে বারান্দার মেঝেতে পড়াগড়ি দিচ্ছেন, বললুম ভাল করে একটা বিছানা পেতে দিই, কিছুতেই না। বললেন—না আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, আমরা হলুম গাঁওয়ালী ভূত কি না। আচ্ছা ভাই পল্লীগ্রামের লোকেরা কি খাট বিছানায় শোয় না? দেখে এস না একবার কাণ্ডখানা!

সুষমা বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—দাদা।

—কী, স্বষা এলে নাকি, খপর কি বল?

—এই আপনার বাইরের ঘরটা একটু গুছিয়ে দিতে এলুম দাদা।

—এখনই হুকুম জারী হয়ে গে'ছ বুঝি, যাও তামীল কর গিয়ে।

—আচ্ছা আপনি না বলেছিলেন বৌদির সামনে আমায় আমার ভাল নাম ধরে ডাকবেন।

—থুড়ী, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে ভাই, অভ্যাসটা নাকি মলেও সংগে যায় সেটা এত সহজে যাবে কি করে, তা বল?

সুষমা রামলালকে ডাকিয়া বলিয়া দিল—বড় বাড়ী থেকে, আমাদের গোবিন্দ মালীকে একবার ডেকে আনতে হবে যে রামলাল।

তাকে পেরেকের বাক্স আর কিছু ছবি খাটাবার রশি আনতেও বলে দিও।

আশ্চর্য হইয়া রামলাল বলিল—ব্যাপার কি পিসিমা এই দুপুর রোদে?

ননদ ও ভাজ দুজনে কোমরে আঁচল জড়াইয়া কাজে লাগিয়া গেলেন।

বাহির হইতে ডাক শুনিতে পাওয়া গেল—চন্দরবাবু ও-চন্দর কোথায় হে?

—আসুন দাদা এই ভিতরের দিকে আসুন।

—একি মেঝেতে শুয়ে কেন?

—যে গরম দাদা, মাটির শরীর মাটির সংগে একটু সদ্ভাব রাখা বোধ হয় দরকার। আর আমাদের ব্যবসা ত জানেন ঐ মাটি কাটা, মাটি খাটা, মাটি কেনা ও মাটি বেচা ইত্যাদি, নয় কি? সরল মতি সতীশবাবু উচ্চহাস্য সহকারে কহিলেন—আচ্ছা পাগল তুমি, ভাই চন্দর।

চন্দ্রবাবু হাঁক দিলেন—সুষমা তোমাদের ওদিকের কাজ কতদুর হল, দাদা যে এসে গেছেন, খাতির টাতির কর এসে। ভিতর হইতে উত্তর আসিল—আমরা জানতে পেরেছি দাদা। আমাদের কাজ শেষ করে ফেলেছি।

হটাৎ কি কথা মনে হওয়াতে উত্তেজিত চন্দ্রবাবু লাফাইয়া উঠিলেন ও দাদার হাতে বইখানা দেখিতে দিয়া দ্রুতপদে বাহিরের হল ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। প্রথমেই সুষমাকে দেখিয়া বলিলেন—কী তুমি এই বেশেই দাদার সামনে যাবে নাকি?

—আমার যাওয়া কি দরকার, চন্দরদা?

—বারে ওঁর বোনই যদি ওঁকে খাতির করলে তবে আমাদের করা

হবে কি করে? তোমাকেই এখন ও রাত্রে খাবার দিতে হবে আর তোমাকে কাছে বসে ওঁকে খাওয়াতেও হবে। নাও একটু ভাল করে সাফসোফ হয়ে নাও দেখি, লক্ষ্মীটি। তাগাদা নেই এখনও দু'ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

ফিরিবার সময় হাসিমুখে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে স্বগত বলিতে লাগিলেন—হাঁ যদি লাগাতে পারি, তবে একটা কাযের মত কায হয় বটে। ইকনমিক্যালি পারফেক্ট। সকল দিক থেকেই নিভুঁল। ঘাড় ফিরাইয়া সুষমার মুখের পানে চাহিয়া লইয়া স্বগতোক্তি করিলেন—কলিকালে মদন ভস্ম না হ'তে পারে, কিন্তু কুমার-সম্ভবের ভিত্তি—হরগৌরী মিলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখছি।

প্রভা বলিল—"সু", তুমি ওবাড়ী থেকেই গা ধুয়ে তৈরি হয়ে এস ভাই, আর গোবিন্দকে বল ঐ ফলের ঝুড়ীটা যেন নিয়ে যায়। আজ একজন চীনা মিস্ত্রী আমাদের রায় সাহেবকে এক টুকরী ফল ডালী পাঠিয়েছিল, আমি তা থেকে ভাল দেখে বেছে বাবা ও কাকাবাবুর জন্যে ঐতে রেখেছি, আর সুবিধা হয় যদি, দুখানি রেকাবি পাঠিয়ে দিও। বেশি দেরি করোনা যেন, এই বলিয়া প্রভা বঁটী পাতিয়া ফল ছাড়াইতে বসিল।

যথা সময়ে সুষমা প্রস্তুত হইয়া,—যেন একটি জাপানি পুতুল—দু' ডিস ভরা মিষ্টান্ন ও দুখানি খালি রেকাবি সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

—কৈ চা কোথা বৌদি?

—দাদা ত চা খান না, তুমি ফলের ডিস্ আগে দিয়ে এস ভাই। সুষমার আনিত আগরার শ্বেত পাথরে মীনার কাজ করা সুন্দর রেকাবিতে প্রভা ফল সাজাইয়া দিল।

সম্মুখস্থ বড় আয়নাখানির মধ্যে সুষমা নিজেকে একবার উত্তমরূপে

দেখিয়া লইয়া পরে মৃদুমন্থর গতিতে আসিয়া ফলের রেকাবি দুখানি টিপয়ের উপর রাখিল ও জোড় হাত তুলিয়া সতীশ বাবুকে নমস্কার জানাইল। সরল প্রকৃতি প্রোফেসর বিস্ময় মুগ্ধ নেত্রে সুষমার আগাগোড়া একবার উত্তমরূপে দেখিয়া লইলেন এবং প্রতি নমস্কারের পর চন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করিলেন—ইনি হন কে হে চন্দর, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

চন্দ্রবাবু আপন মনে ভাবিলেন—সবুর কর বন্ধু, ঘনিষ্ঠতম আলাপ জমিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন স্বয়ং চন্দর রায়, দেখা যাক তাঁর কেরামতিটা। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন—কি বলছিলেন দাদা, পরিচয়—হাঁ। ইনি হচ্ছেন ষষ্ঠী বুড়ী, আমাদের দেশের ষষ্ঠীতলায় গাব গাছে বাসা করে থাকতেন, এখন সাগর পার হয়ে এসেছেন আমাদের দেখা দিতে। —ষষ্ঠীবুড়ী বলে ত মনে লাগছে না। এযে একেবারে শচীদেবীর কাউণ্টার পার্ট। লজ্জা নম্র সস্মিত মুখে চলিয়া যাইতে যাইতে সুষমা বলিয়া গেল—মুখ ধুয়ে ফেলবেন না যেন, আমি মিষ্টি আনছি।

সুষমা বাহির হইয়া গেলে সতীশবাবু চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি কে হে? চন্দ্রবাবু নিজের বুক ঠুকিয়া মাথা উচু করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—চন্দর রায়ের বোন।

—তোমার আবার বোন এলো কোথা থেকে?

—পরে বলছি, এখন কেমন দেখলেন বলুন ত?

—একটু স্নিগ্ধ হাস্য সহকারে সতীশ কহিল—জিনিষটি ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

কৃত্রিম ক্রোধে চক্ষু ঘুরাইয়া চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—ভাল ত বটেই একি শুধু যেমন তেমন ভাল, রিয়েল ইয়াখুদ—খাঁটি প্রথম শ্রেণীর রুবি, বর্মা রুবি মাইনের ফাস্ট ক্লাস প্রডাক্ট, এই চন্দ্রকান্তের ভগ্নী, শঙ্কর লাল মিত্তিরের আদরের ছোট মেয়ে, বিদুষী আর কেমন

রূপসী সেতো—দেখলেনই। কেমন পেতে চান? কোন দিকেই ঠকা হবে না, দাদা।

—বল কী চন্দ্র? আমার মত একজন সামান্য স্কুল মাষ্টারকে ওরা নগণ্যের—সামিল করবে যে হে।

—আপনি সামান্য স্কুল মাষ্টার? প্রোফেসার সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, পি আর এস প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ স্কলার, ইণ্ডিয়ান এডুকেসন সার্ভিস, স্বনামখ্যাত ডাইমণ্ড মার্চেণ্ট শ্যামাচরণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর সবার ওপর আমার দাদা—সেকি সহজ লোক?

মিষ্টান্নের ডিস লইয়া যাইবার সময় প্রভা হাসিতে হাসিতে সুষমাকে কানে কানে বলিয়া দিল—দেখিস ভাই, ভাল মানুষ পেয়ে আমার দাদাটিকে, মিষ্টির সংগে কিছু গুণ-গান মন্তর করে দিসনি যেন। পরে স্বগত—"যেরূপ শঙ্কর বিজয়, মোহিনী রূপ ধরে আজ বেরিয়েছ তাতে গুণ-গানের আর বোধ হয় দরকার হবে না।"

সুষমা কহিল—তাহলে সে মন্তরটা তোমার ভাল করে জানা আছে বোধ হয়। শিখিয়ে দাও না, একবার আবার হরের ধ্যান ভঙ্গ করবার চেষ্টা করি, বৌদি!

প্রভা সুষমার গালদুটি টিপিয়া দিয়া সদুঃখে বলিল—আঃ আমার পোড়া কপাল! মন্তর জানলে কি আমায় সাত বছর ধরে শকুন্তলার মত নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে হয় ভাই?

—কেন এখন ত শকুন্তলার মত সোহাগিনী পাটরাণী হয়ে বসেছ।

—সে ভাই তোমাদেরই হাত যশ।

৬৩

আগামী সোমবার ইংলিস মেলে মিঃ ঘোষের প্যাসেজ বুক করা হইয়াছে। বর্মার বিলাতগামী মেল তখন কলিকাতা হইয়া বম্বে যাইত।

বুধবার একটি স্থানীয় ছুটি স্কুল কলেজ সব বন্ধ কিন্তু কলেজের গভর্নিং বডির মিটিং আজকার তারিখেই পূর্ব হইতে স্থির হইয়াছিল। মেম্বারদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য প্রিন্‌সিপাল সাহেব নবাগত যুবক প্রফেসার ঘোষকে মিটিংএ উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে সতীশ বাবু আজ মিত্র সাহেবের বাড়ির ভোজে আসিতে পারেন নাই।

দুই কর্তা এবং চন্দর ও পানু একত্রে আহারে বসিয়াছেন। তখনকার রীতি অনুসারে মিত্র গৃহিণী শ্যামবাবুর সম্মুখে আসিবেন না, আর বৌমা প্রভা চন্দ্রবাবুর উপস্থিতিতে কর্তাদের সামনে আসিতে পারেন না, সুতরাং পরিবেশনে ফ্রণ্ট লাইনে ডিউটি পড়িয়াছে সুষমার উপর।

সুষমার দুতিন রাউণ্ড শেষ হইবার পর ঘোষবাবু বলিলেন—দেখ শিবু তোমার এই শান্ত মেয়েটিকে আর ওর এমন সুন্দর কাজকর্ম দেখলে মনে হয়—আমার এই মা লক্ষীটি যে ঘরে যাবেন, সেখানের মাটিতে সোনা ফলবে।

—তা হ'লে তুমিই কেন ওকে নাওনা ভাই, তোমার উপযুক্ত ছেলে ত রয়েছে।

ঘোষ বাবু বিষন্ন চিত্তে কহিলেন—আর ভাই ঐ খানেই ত গোল, কত ভাল ভাল সম্বন্ধ ঠিক করলুম কিন্তু ও ব্যাটাকে কিছুতে রাজী করাতে পারা গেল না। তা না হ'লে আমি এমন মেয়ে কি ছাড়ি?

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রবাবুর গলার মধ্যে একটি শুখনা কাশির উদ্বেগ দেখা দিল। তিনি তাহা সহজেই দমন করিয়া লইলেন এবং খাওয়া শেষ হইবামাত্র দ্রুত পদে অন্দর মহলে প্রবিষ্ট হইয়া কাকীমার সহিত নিরালায় অনেকক্ষণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পর ভিতর হইতে মিত্র মহাশয়ের ডাক আসিল। তিনি গিন্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চন্দ্র তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া

আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর গো তোমাদের ? গিন্নী চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন,—চন্দর জিজ্ঞাসা করছে আমরা সতীশের সংগে বুড়োর বিয়ে দিতে পারি কি না ?

মিঃ মিত্র উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—বাঃ অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কন্যাদান করতে পারা ত সৌভাগ্যের কথা, গিন্নী। কিন্তু সতীশের বাবা এইমাত্র বলছিলেন যে—ছেলেকে বিবাহে রাজী করাতে পারা যায় নি, আজ পর্য্যন্ত।

চন্দ্র—আপনারা কথা বার্তা সব ঠিক করে ফেলুন, সতীশদাকে রাজী করাবার ভার চন্দরটাকে দিন। আপনারা আমার জন্য এত করছেন, আপনাদের এই সামান্য কাজটুকু করবার সৌভাগ্য আমায় দিন, কাকাবাবু।

—দীর্ঘজীবি হও বাবা।

মিঃ মিত্র বাহিরে ফিরিয়া আসিলেন,—পিছনে চন্দ্র, যেন কত নিরীহ কিছুই জানে না,—ও দীপ্ত মুখে কহিতে লাগিলেন—ওহে শ্যাম অসময়ে হাইকমাণ্ডের তলব পেয়ে ভয়ে ভয়েই ভিতরে গিয়েছিলাম কিন্তু একটা সুখবর নিয়েই ফিরলাম। তুমি যদি আমার মেয়ে বুড়া কে, যার কথা তুমি একটু আগেই বলছিলে, তোমার ঘরে নিয়ে যেতে চাও, তবে সতীশের সে বিষয়ে মত করবার ভার একজন পাকা লোক নিয়েছেন, অর্থাৎ আমাদের চন্দর বাবাজীবন !

—কী গো চন্দর সত্যি নাকি ?

—আজ্ঞে হাঁ, সে ঠিক হ'য়ে যাবে সব।

শ্যামবাবু—তা হলে সতীশ আজ রাত্রে এলে তাকে একবার মেয়ে দেখিয়ে দিলে ভাল হয় না ?

চন্দ্রবাবু মনে মনে হাসিতে হাসিতে প্রকাশ্যে গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে সে সব ঠিক আছে। দুই কর্তা পরস্পরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন

দৃষ্টিতে চাহিলেন, তাঁহাদের চক্ষে একটু চাপা হাসির রেশ খেলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় তাঁহারা ছোট সিরাজীর সংগে দু' একজন জুয়েলারের দোকান ঘুরিয়া দুটি ভেলভেটের জুয়েলারি বাক্স পকেটে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

ঐ রাত্রেই ঠিক হইয়া গেল—যখন আগামী শুক্রবার প্রাতে শুভক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, তখন ঐ সময়েই পাত্র পাত্রীর শুভ বৈবাহিক আশীর্বাদ ক্রিয়া ও উৎসব সম্পন্ন করা হইবে। এবং দুই মাস পরে অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় সকলে একত্র হইয়া কোন এক সুতহিবুক যোগে যথাবিহিত সাড়ম্বরে বিবাহ কার্য সমাধা করিবেন।

৬৪

আজ শুক্রবার শুভ আশীর্বাদের দিন। কর্তারা চন্দ্র ও পানুকে এই উৎসবের পরিকল্পনার ও পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাহারা নব্য সম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে যে কার্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন কর্তৃপক্ষ তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদনও করিয়াছেন।

মিত্র সাহেবের বাড়ীর দোতলার পূর্বদিকের বড় হলঘর সুরুচি-সংগত সুন্দররূপে পত্রপুষ্প দ্বারা সাজান হইয়াছে। ঘরজোড়া মেঝেতে বিচিত্র যুগ্ম-ময়ূর ডিজাইনের কার্পেট বিছান, মধ্যস্থলে একখানি নিচু ছোট চৌকি, জরির কাজ করা মখমলের কভার ঢাকা। ঐ চৌকির উপর মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহাস্য কল্পতরু মূর্তির ছবি স্থাপনা করা হইয়াছে এবং তাহার পাদদেশে রুপার থালায় পুষ্প মাল্য চন্দন ধান দূর্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক আশীর্বাদের দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঠাকুরের চৌকির সম্মুখে কারপেটের উপর পাশাপাশি দুইখানি সলমার কাজ করা আসন পাতা। শুভক্ষণ আরম্ভ হইবা মাত্র, মাল্য চন্দন ও সময়োচিত বস্ত্রাদি ভূষিত সতীশ ও সুষমাকে আনিয়া ঐ দুই খানি আসনে বসান হইল। সংগে পরিবারের ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ হলে সমবেত হইলেন।

প্রথমেই শ্যামাচরণ বাবু সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন—তোমার কাজ তুমি কর ঠাকুর আর আমরা ভাবি আমরা করি। শ্যামাচরণবাবু পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ গৃহী শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম। সমবেত সকলের ঠাকুর প্রণাম শেষ হইলে আশীর্বাদ কার্য আরম্ভ হইল।

সর্বাগ্রে ঘোষ মহাশয় কন্যাকে ধান দুর্বাদি দ্বারা আশীর্বাদ করিলেন ও কপালে চন্দন তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং পরে পাত্রীর হাতে একটী জুয়েলারী বাক্স প্রদান করিলেন, তথন মিত্র গৃহিণী অগ্রসর হইয়া ঐ বাক্সটি হইতে একছড়া মূল্যবান মুক্তার সেলী বাহির করিয়া সুষমার গলায় পরাইয়া দিলেন। মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

এই প্রথম মিত্র গৃহিণী শ্যামবাবুর সমক্ষে বাহির হইলেন, আজ যে তাঁহাদের মধ্যে একটি মধুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইল।

তাহার পর মিত্র মহাশয় পাত্রকে অনুরূপ আশীর্বাদ করিয়া পাত্রের অঙ্গুলিতে একটি বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী পরাইয়া দিলেন। আবার মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

ইহার পর চন্দ্রবাবু পাত্রের ব্যক্তিগত বিদুষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নানারূপ হাস্যকর অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে তিন দানা বসান একটি পান্নার ওয়েডিং রিং পাত্রীকে উপহার দিলেন। সকলে করতালির সহিত উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

পর দফায় বালক রঙ্গলাল পাত্রীর প্রতিভূ স্বরূপ পাত্রকে রজত

আধারস্থিত এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা উপহার দিয়া নমস্কার করিল, সকলে করতালী দ্বারা তাহা সমর্থন করিলেন।

এইরূপে আশীর্বাদাদির পর পাত্র পাত্রী গুরুজনদিগের পদধুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র, চন্দ্রবাবু হস্ত উঠাইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—জয় গুরু মহারাজকি জয়। সমবেত জনমণ্ডলী তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন।

জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ফুলের গন্ধ ও শোভন সুন্দর শরতের প্রভাত সূর্য্যের বিমল উজ্জল কিরণ একত্রে মিলিত হইয়া উৎসবের পরিবেষ্টন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল।

৬৫

পরদিন বাগানে সতীশবাবুকে একলা পাইয়া চন্দ্রবাবু ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত দুটি হাত পাতিয়া বলিলেন—দাদা আমার ঘটকালিটা।

—হবে হবে বৌ এসে তোমার দুটি কান আচ্ছা করে মলে দিয়ে ঘটকালিটা পুরো করে দিয়ে দেবে।

—এ বৌটি দ্বারা সেটি হবে না দাদা, পারতেন যদি একটি বার্মিজ "মা খিন", কি "মা সুয়ে" কে বিয়ে করতে, তা হলে কান মলা কেন "ফনা নে ছা মে" অর্থাৎ পাদুকা প্রহার পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারত। সত্যই বলছি দাদা আপনাদের এইরকম নব্যতন্ত্রের নাটকীয় বিবাহ দেখে আমার আবার একটা বিয়ে করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

—বাবুর শখ ত কম নয়, একটা বিয়ে করেই তাকে ছেড়ে গাঢাকা দিলেন, আবার আর একটা বিয়ে।

—কী বলেন দাদা, যে পনের বছর বয়সে একটা বিয়ে করতে পেরেছে এই চব্বিশ বছরে সে কী ডরায় দাদা আরও দুটো করিতে বিবাহ?

—আচ্ছা তার একটা প্ল্যান আমি করে রেখেছি, আমার মনোমত করে শীঘ্রই তার একটা ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা আছে।

—সে কী দাদা, অর্থাৎ বোনের একটা সতীন যোগাড় করে দেবেন নাকি?

—তা কেন হবে, ইন্দুর সঙ্গেই তোমার বিবাহের একটা জয়ন্তী, মিলন উৎসব খুব ঘটা করে করব মনে করছি, তাতে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে, বলে রাখছি।

—হাঁ দাদা এইবার একটা সেনসেবল কথা বলছেন বটে, তা আমার ইকনমিক্স্ আর আপনার ম্যাথামেটিক্স দুই মতেই একেবারে রাইট! দেখুন দাদা আপনারা যেমন আপনার বোনটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন আমিও সেইরূপ আমার বোনটিকে আপনার হাতে দিতে পারলাম এটা কি আমার সহজ আহ্লাদের কথা?

তখন সতীশবাবু উঠিয়া চন্দ্রবাবুর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জোরে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—চন্দর সত্যই তুমি একটি "জীবন্ত ইকনমিক্স"।

৬৬

পাঁচ বৎসর একাক্রমে পোকোকোতে কণ্ট্রাক্টারি কার্য করিবার পর দেশে ফিরিবার পথে রেঙ্গুনে পৌছিয়া দেখিলাম—চন্দ্রবাবুর বাড়ীর লনে, রামলাল আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান মণিমোহনকে লাঠি খেলা শিখাইতেছে। মণি বেশ লম্বা ও জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

রেঙ্গুনে দুই সপ্তাহ থাকিবার সময় জানিতে পারিলাম—নিম্ন লিখিত তিনটি ব্যবসা চন্দ্রবাবু বেশ সুষ্ঠু ভাবে চালাইতেছেন।

১। Burma Land Development Corporation. Ltd

বর্মাল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেসন, তাঁহার প্রথম ও পুরাতন ব্যবসা, চন্দ্রবাবু স্বয়ং ইহার কার্য পরিদর্শন করেন।

২। Indian Silk House, ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস—এখানে বেনারসী গরদ তসর এড়ি মুগা জাপানি ও চাইনিজ প্রভৃতি রেশমী কাপড় খরিদ ও বিক্রয় হয়। কাশীর বিপিন বাবু বর্তমানে এই কারবারের ম্যানেজার।

৩। The Pingado Timber Trading—পিংগাডো টিম্বার ট্রেডিং প্রধানতঃ মারগুই ও উহার নিকটবর্তী জঙ্গল সমূহ হইতে এই পিংগাডো যাহা কলিকাতায় "লোহাকাঠ" বা "লাল সেগুন" নামে চলিত, ঐ টিম্বার কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে রপ্তানি করা হয়।

এই কাজে একজন সিনো-বারমিজ ভদ্রলোক চন্দ্রবাবুর সহযোগী ও অংশীদার, নাম বনৃকুন. ইনি ইংরাজী বার্মিজ ও চিনা ভাষায় বেশ কথা ও কাজ চালাইতে পারেন। কাঠের কাজে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

৪। সংক্ষেপতঃ—ষোল বৎসর পূর্বে যে বালক একটি মাত্র গোটা আধুলি সম্বল লইয়া এই ব্রহ্মদেশে অবতরণ করিয়াছিল সেই চন্দ্রকান্ত রায় আজ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালিক।

এখনও তাঁর কর্মশক্তি ও অনুরক্তি অটুট।

দ্বিতীয় পর্ব শেষ।

(৩রা অক্টোবর ১৯৪২)